কারা
জান্নাতী কুমারীদের
ভালবাসে
ড. আব্দুল্লাহ আয্যাম রহ.

প্রকাশকের কথা

‘কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে’ ১ম খণ্ডের পর ২য় খণ্ডও পাঠকের হাতে তুলে দিতে পারছি এজন্য শুকরিয়ায় মস্তক অবনত করছি মহান রাব্বুল ইজ্জতের দরবারে। দুরুদ ও সালাম পেশ করছি বিশ্বমানবতার মহান দূত শেষনবী মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর।

‘কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালবাসে’ বাংলায় লেখা কোন রচনা নয় বরং অনুবাদ গ্রন্থ। ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর আরবি ভাষায় রচিত ‘উশরাকে হুর’ গ্রন্থের অনুবাদ। উচ্চমার্গের আরবি ভাষা ও সাহিত্যে সমৃদ্ধ বইটির অনুবাদ করেছেন মাওলানা আবুল হাসান। অনুবাদক ও এর সাথে যারা সম্পৃক্ত, তাদের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তাদের দিনরাত এক করা মেহনতগুলো কবুল করে নিন। প্রথম খণ্ড প্রকাশ হওয়ার পর দ্বিতীয় খণ্ড বাজারে আনার জন্য পাঠকদের অনবরত তাগাদা আমাদেরকে অনেক অনুপ্রেরণা দিয়েছে। পাঠক ও প্রকাশনার শুভাকাঙ্খী যারা আছেন তাদের সবাইকে আন্তরিকভাবে শুকরিয়া জানাচ্ছি।

ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহিমাহুল্লাহর ব্যাপারে নতুন কিছু বলার নেই। তিনি এমন একজন আলেম যার ইলম শুধু ইলম নয়, রয়েছে আমলেরও সুচারু স্বাক্ষর; একেবারে সাহাবায়ে আজমাঈনদের আদলে। যার দিন কাটতো তরবারি চালনায়, রাত যেতো জ্ঞানসাধনা আর জায়নামাজ সিক্ত করায়। রঙ্গিন দুনিয়ার চাকচিক্য তখন মাত্র শুরু হয়েছিল। ফোরজি, ফাইভজি স্পীড লাইফের চক্কর তখনও শুরু হয়নি। কিন্তু মুখলিস দ্বীনের দাঈদের ইলহাম যে সর্বকালের ফাস্টেস্ট স্পীডি। ইলহামপ্রাপ্ত দিল বুঝতে পারে অনাগত সময়ের গতিধারা ও কর্মনীতি। শেষযুগের জাহিলিয়াত, ফিতনার সাগর সমান ঢেউয়ের উচ্চতায় যেন বিশ্বাসী যুবসমাজ হারিয়ে না যায়, ঈমানী জিন্দেগানী বেছে নিতে পারে আলেয়াদের আবেদন ভুলে, তার জন্য রচনা করে যান কিছু মূল্যবান গ্রন্থ। ‘উশরাকে হুর’ তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য একটি। শীতের রুক্ষতায় যেভাবে গাছের পাতা বিবর্ণ হয়ে যায়, পাতা ঝরে গাছটি কঙ্কালসার হয়ে

যায়, আবার বর্ষায় করুণাময়ের রহমতের বারিধারায় জেগে উঠে, সবুজ পত্রপল্লবে সুশোভিত হয়ে উঠে। তেমনি যেন জেগে উঠে এই উম্মাহ! শ্রেষ্ঠনবীর শ্রেষ্ঠ উম্মাহ! এই কামনায়।

মানুষের মানবীয় বৈশিষ্টই ভুল করা। তেমনি কিছু মুদ্রণ, অক্ষরবিন্যাসগত ত্রুটি থাকা অস্বাভাবিক নয়। পরিলক্ষিত হলে পাঠক আমাদের জ্ঞাত করবেন- এই প্রত্যাশা আমাদের। পরবর্তী প্রকাশে সংশোধনের প্রত্যয় রইল। সবশেষে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়াতায়ালার কাছে একটাই চাওয়া- পরকালের কঠিন দিনে তিনি যেন আমাদের পাকড়াও না করেন।

ওয়াসসালাম

সূ।চি।প।ত্র

আল ইহুদা

একজন খালিদ বিন ওয়ালিদ রা., তারেক বিন যিয়াদ, সালাউদ্দিন আইয়ুবী রহ.-এর প্রতীক্ষায়... ।

শহীদ আবু ফজল

ঈদুল ফিতরের দিন যে ছয়জন শাহাদত বরণ করেছিল তাদের পঞ্চমজন হচ্ছে আবুল ফজল। উজ্জ্বল চেহারার টগবগে এক যুবক। লম্বা পাতলা দাড়ি তার চেহারার সৌন্দর্য আরো বৃদ্ধি করেছিল। সে এতোটা বাকসযংমী ছিল যে, দূরের লোকেরা তাকে বাকশক্তি রহিত মনে করত। সচরাচর তাকে একেবারেই কথা বলতে দেখা যেত না। রাত-দিন সে ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকত। তাঁবুতে তার দায়িত্ব ছিল আমীরের নির্দেশ ও নির্দেশনা লিপিবদ্ধ করা। সুতরাং যখনই মজলিস হতো, কলম হাতে সবার আগে এসে হাযির হত। অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টিতে আমীরের সব কথা শুনত এবং সঙ্গে সঙ্গে লিখে ফেলত। সঙ্গী-সাথীদের মজলিসে যখনই দুনিয়াবী আলোচনা শুরু হতো তখন আস্তে করে উঠে চলে যেত।

মূলত সে আফগানিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ কোন অভিযানে শরীক হওয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিল। কিন্তু হঠাৎ করেই জাজী পর্বতের ট্রাজেডি তাকে তৎক্ষণাৎ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করল। ৩০শে রমযান চাঁদ রাতে যখন আমীর সবকিছু নিয়ে ঐ স্থান ত্যাগ করার হুকুম দিলেন, তখন সে অজানা কারণে আমীরের কাছে ওখানেই থেকে যাওয়ার অনুমতি চাইল। আমীরের অনুমতি পেয়ে সে থেকে গেল এবং ঐ রাতেই শাহাদাত লাভ করল। সঙ্গীরা তাকে শহীদ মানছুরের পাশে দাফন করল।

আব্দুল্লাহ আল-মিসরী

আমাদের ষষ্ঠ শহীদ হচ্ছে আব্দুল্লাহ আল-মিসরী। তার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় সেবা-শুশ্রূষা কেন্দ্রে। তখন তার সাথে ছিল হারুন। হারুন ছিল তার চলার পথের সদা-সঙ্গী। তার সাথেই আব্দুল্লাহ কান্দাহারে এসেছে। কিন্তু সে ফিরে যেতে চাচ্ছিল, আমি তার সাথে প্রফুল্ল আচরণ করলাম। সে আমার কাছে বিভিন্ন কষ্টের অভিযোগ করল। আমি তাদেরকে কিছু সান্ত্বনার বাণী শুনিয়ে শান্ত করলাম।

তারা সাদা'য় গিয়েছিল, সেখানে কাফেরদের ফেলে যাওয়া প্রচুর অস্ত্র-শস্ত্র হস্তগত হল। তারপর তারা পাহারার কাজে আমার ক্যাম্পে এসেছিল। তারপর সে বযাওয়াস্ত ফিরে গেল। তারপর আবার সাদা'য়, আবার আমার ক্যাম্পে। আসলে যেখানেই তারা ভয়াবহ যুদ্ধের খবর পেতো সেখানেই ভীষণ আগ্রহ নিয়ে ছুটে যেতো।

আব্দুল্লাহ খুবই উদার মনের মানুষ ছিলো। কথাবার্তা খুবই কম বলতো, দীন-দুনিয়ার কাজে আসবে সবসময় এমন জিনিসের খোঁজে থাকতো। যদি কথা বলতো তাহলে খুবই কম এবং বিনয়ের সাথে। অধিকাংশ সময় সে কোন না কোন কিতাব হাতে পড়ায় ব্যস্ত থাকতো। প্রায়ই বলতো, আমার এই অধ্যয়ন লড়াইয়ের ময়দানে কাজে লাগতে পারে। শেষ যে অভিযানে তাকে পাঠানো হয়েছিলো, সেখান থেকে সে আর ফিরে আসেনি, সেটাই ছিল শেষ বিদায়। জানা যায়নি সে কোন গিরিপথে হারিয়ে গেছে, নাকি এইসব কুকুর-নেকড়েদের হাতে বন্দী হয়েছে, নাকি শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে আল্লাহর কাছে চলে গেছে?

আমরা আল্লাহর কাছে আশা রাখি, তিনি তাকে এবং আমাদেরকে শাহাদাত দান করবেন এবং সালেহীনদের সাথে হাশর করবেন।

টিকাঃ পরবর্তীতে আমাদের কাছে তার শাহাদাতের খবর পৌঁছেছে।

শাহাদাতের পিপাসা

(আবু খালিদ আল-জাযায়েরী)

জিহাদে অংশগ্রহণকারী যুবকদের ক্ষেত্রে শুরু থেকেই আমি লক্ষ্য করছি যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির এই পথে আসতে পেরে ভীষণ খুশি। এখন তাদের একটাই তামান্না, শহীদ অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মোলাকাত করা। যেহেতু তারা জীবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করেছে শুধু আল্লাহর জন্য। ভোগ-বিলাস ও আনন্দ-বিনোদন বিসর্জন দিয়েছে শুধু আল্লাহর পথে আসার জন্য। সুতরাং শাহাদাতই তাদের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া স্বাভাবিক। ফলে

প্রায়ই তাদেরকে বলতে শোনা যায়, কখন আল্লাহর হুকুম হবে, কখন শাহাদাতের সা'আদাত নছীব হবে! আর আমরা জান্নাতী হুর-পরীদের সাথে মিলিত হবো!!

ইতিমধ্যেই শুরু হল নতুন এক অভিযান। রণাঙ্গনে কী ঘটছে প্রতিমুহূর্তে সেই তাজা তাজা খবরগুলো পরিবেশিত হচ্ছে। একজন ওয়ারলেস ধরে রেখেছে। বাকীরা চারপাশে জড়ো হয়ে মনোযোগসহ শুনছে। পরিস্থিতি বুঝে আমীর একজনকে এক কাজের নির্দেশ দিচ্ছেন। কিছু নির্দেশনা উচ্চস্বরে দিচ্ছেন, আবার কিছু কথা কানে কানে বলছেন। একে ডাকছেন, ওকে ইশারা করছেন। তবে এমন ব্যস্ততম কঠিন পরিস্থিতিতেও সবার মধ্যে অন্য রকম একটা প্রশান্ত অবস্থা বিরাজ করছে। আমীরের চেহারায় ক্লান্তির ছাপ সুস্পষ্ট। কারণ সবারই কম-বেশী বিশ্রামের সুযোগ আছে। কিন্তু আমীরের একমুহূর্ত ফুরসত নেই।

হঠাৎ খবর আসল রুশ কমাণ্ডো বাহিনী পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত মুজাহিদদের কেন্দ্রিয় ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তরুণ গোলন্দায বাহিনী বৃষ্টির মত গোলা ছুঁড়তে লাগল। মুজাহিদদের তীব্র আক্রমণের মুখে সবাই পিছু হটতে বাধ্য হল। কিছু তো চোখের সামনেই জাহান্নামে পৌঁছে গেল। আর কিছু লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেল। মুজাহিদরা নিজেদের কেন্দ্রকে মানব-ঢালের নিরাপত্তা বেষ্টনীতে সুসংরক্ষিত করে রাখত।

যা হোক, আমাদের সাংবাদিক দল বেতারের মাধ্যমে রণাঙ্গনের অবস্থা প্রতিমুহূর্তে মুজাহিদদের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। সারাদিন তো বটেই, এমনকি শেষ রাত পর্যন্ত ওয়ারলেসে সংবাদ আসছে। শায়েখ সাইয়াফ বলছেন- সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহা পরাক্রমশালী আল্লাহই সবকিছু করছেন। আমাদেরকে শুধু পর্দা হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তা না হলে এমন অস্ত্রসজ্জিত বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমাণ্ডো বাহিনীর সামনে আমরা নগণ্য ক'জন মুজাহিদ কিছুই না।

সংবাদের মাঝখানেই এ্যাম্বুলেন্সের আওয়াজ ভেসে আসল। বোঝাই যাচ্ছে গুরুতর আহতদেরকে হাসপাতালে নেয়া হচ্ছে। আহতদের মধ্যে আবু

খালেদের অবস্থা আশংকাজনক ছিল। হাসপাতালে নেয়ার পথে সে শাহাদাত বরণ করল। আর আবু সাহাল সংজ্ঞাহীন ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহ তাকেও শাহাদাত নছীব করেছেন।

শহীদ আবু সাহাল

আবু সাহালের বিষয়টা আমার কাছে বরাবরই বিস্ময়কর মনে হয়েছে। হ্যাংলা-পাতলা, অল্পশিক্ষিত একজন গ্রাম্য লোক। পঞ্চাশের ঘরে যার বয়স। তাকে দেখলে কেউ বিশ্বাসই করতে পারবে না যে, আফগানিস্তানের মত পাহাড়ী অঞ্চলে বিপদসংকুল দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে সে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছতে পারবে। কারণ বহু টগবগে যুবক, বড় বড় বীর-পাহলোয়ান এখানে এসে নিস্তেজ হয়ে পড়েছে!

কিন্তু অন্য অনেকে যা পারেনি আবু সাহাল তা করে দেখিয়েছে। কারণ তার মাঝে ছিল বীরত্ব ও পৌরুষ, গায়রত ও আত্মমর্যাদা এবং প্রতিশ্রুতির দৃঢ়তা। মূলত এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্যই তার মত সাধারণ মানুষকে অসাধারণ ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে। শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও তার আদব-আখলাক ছিল অনন্য সুন্দর। আমার সঙ্গে সবসময় মাথা নিচু করে কথা বলত। কখনো অপ্রয়োজনীয় কথা বলত না। কারো গীবত-শেকায়েত করত না। অহংকার, বিদ্বেষ, অহমিকা ও হঠকারিতা কী জিনিস তা সে জানতই না। দলাদলির প্রতিও তার কোন আকর্ষণ ছিল না। সে ছিল সরল চিন্তা ও সুস্থ রুচির সাধারণ একজন মানুষ। ছোট-বড় সবার প্রতি তার ছিল একরকম ভালোবাসা। এমন মানুষ আল্লাহর খুব প্রিয় হয়ে থাকে। সেও ছিল আল্লাহর একজন মাহবুব বান্দা। তাইতো শাহাদাতের পর তার পবিত্র দেহ থেকে অপূর্ব এক জান্নাতী খুশবু চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। জান্নাতে আল্লাহ তার মাকাম বুলন্দ করুন। আমীন।

শহীদ আবুল ওয়ালীদ

রুশ বাহিনীর সঙ্গে আমাদের যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে রমযান মাসের এই যুদ্ধটি সেগুলোর মধ্যে সবচে' ভয়ংকর রক্তক্ষয়ী ও গুরুতর ছিল। বিশেষত ২৭ এর পর থেকে ঈদের দিন পর্যন্ত এই সময়টুকু রুশ বাহিনীর জন্য ছিল অত্যন্ত বিভিষীকাময়। একদিন তিনজন ট্রাক চালক ভীষণ আতংকিত হয়ে আমাদের কাছে আসল। তারা (বড় রুশ বাহিনী) আমাদের ট্রাকগুলো ছিনিয়ে নিয়েছে। ওদের মধ্যে একজন বলল, আমরা ট্রাক ভরে লাশ নিয়ে যেতে দেখলাম, লাল চামড়ার লাশগুলো নিশ্চয়ই রুশ সেনাবাহিনীর মরদেহই হবে।

যুদ্ধচলাকালীন আমি একটা সাধারণ কামরায় অবস্থান করতাম। গোলা-বোমা কিংবা রকেট লাঞ্চার বরং সাধারণ কোন আক্রমণ প্রতিহত করার কোন ব্যবস্থা সেখানে ছিল না। আর রুশদের আক্রমণের সময়সূচীও আমার মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ঠিক ভোর সোয়া ছয়টায় তারা বিমান থেকে প্রথমবার গোলা ছুঁড়ত। তারপর সকাল নয়টায় দ্বিতীয়বার হামলা চালাত। আর এটা ওদের নিয়মিত রুটিনে পরিণত হয়েছিল। আমাদের গোলন্দাজ-বাহিনীও সর্বক্ষণ পূর্ণ সতর্কাবস্থায় থাকত। ওদের বিমান আকাশে ওড়ামাত্র মুজাহিদরা বোমা হামলা ও কামান দাগানো শুরু করতো। প্রায় প্রতিদিনই শত্রু বাহিনীর দুই-একটা বিমান বিধ্বস্ত করা হতো।

সারা দিনের যুদ্ধক্লান্ত দেহগুলো সন্ধ্যার পর একটু বিশ্রামের সুযোগ পেল। তখন সারাদিনের খোঁজ-খবর জানার জন্য ওয়ারলেস খোলা হলো। আর তখনই এই শোক সংবাদ ঘোষিত হল, আবুল ওয়ালীদ শহীদ হয়েছে।

আবুল ওয়ালীদ ছিল সুন্নত তরীকায় জীবন যাপনকারী একজন যুবক। বেশ-ভূষা ছিল খুবই সাধারণ। জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর প্রতি তার ছিল সীমাহীন অনুরক্তি। সমগ্র আফগানিস্তান সে চষে বেড়িয়েছে মজলুম মুসলমানদের সাহায্যে, কাফির-মুশরিকদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে। সর্বশেষ বলখ অঞ্চলের মুজাহিদ ক্যাম্পে স্থায়ী হয়েছিল। মাঝে একবার পরিবারকে সঙ্গ দেয়ার জন্য কিছু সময়ের জন্য বাড়িতে গিয়েছিল। কিন্তু বাড়িতে মন না টেকায় বেশি দিন দেরি করতে পারেনি। আসলে জিহাদের জযবা যার মধ্যে

একবার প্রবেশ করে সে অন্য কোথাও আর শান্তি পায় না। আর এটা স্বাভাবিক। কারণ চোখের সামনে নিরাপরাধ মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, নিরীহ মুসলমানদেরকে অমুসলিম শুকুর-কুকুররা খুবলে খুবলে খাবে, চোখের সামনে অসহায় মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠিত হবে- একজন মুজাহিদের পক্ষে এটা বরদাশত করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

যাহোক, ঈদুল ফিতরের দিন রুশ বাহিনীর ২৫ জন সেনা আচমকা মুজাহিদদের উপর হামলা চালায়। তখন ২৫ জনের মোকাবিলা করার জন্য মাত্র তিনজন বীরযোদ্ধা অগ্রসর হয়, আবুল ওয়ালীদ, ইয়াসীন ও খিজির। ইয়াসীন ছিল অত্যন্ত সাহসী। চোখের পলকে সে হামলা করে আবার নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে পারে। খিজিরও বোমা মেরে একজনকে ছিন্নভিন্ন করে জাহান্নামের লাকড়িতে পরিণত করেছে। কিন্তু আবুল ওয়ালীদ তাকে সর্বোত্তম বিনিময় প্রদানের জন্য আল্লাহ ঈদুল ফিতরের দিন তথা প্রতিদান দিবসকে নির্বাচন করে রেখেছিলেন। সে শাহাদাতবরণ করল। ইরশাদ হয়েছে-

"প্রত্যেক নফস মৃত্যুবরণ করে আল্লাহর নির্দেশে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারণকৃত সময়ে।"

আবুল ওয়ালীদের অন্তরে ছিল শাহাদাতের সীমাহীন পিপাসা ও তামান্না। আর শাহাদাত লাভের বিষয়ে সে আত্মবিশ্বাসীও ছিল। তাই সে অভিযানে শরীক হওয়ার আগে দুটি পত্র লিখে গিয়েছিল। তার শাহাদাতের সুসংবাদ শোনার পর আমি সেই চিঠি দুটো খুলে পড়লাম।

সে তার সহযোদ্ধা সামিরকে লক্ষ্য করে বলছে-

"তোমার ঈদ তো আসে সারা বছরে মাত্র দুই বার। আর আমার ঈদ আসে ঘুরে ফিরে অসংখ্যবার। যদিও আমার তোমার এবং আমাদের সবার আসল ঈদ হবে সেদিন, যেদিন আফগানিস্তানের মাটি স্বাধীন হবে কাফের-মুশরিকদের হাত থেকে।"

চিঠির সমাপ্তিতে ছিল এই কবিতাপংক্তি–

“ওহে আমার জান্নাত, প্রবাহিত করো তোমার সমীরণ
তোমারই তরে খোদার রাহে জীবন করেছি কোরবান।”

আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস, আল্লাহর ওয়াদাকে তুমি সত্যরূপে পেয়েছো এবং জান্নাতরে সুউচ্চ মাকাম হাছিল করেছো। আমীন।

বশীর ও সুরাকার ‘শাহাদাত’

ঈদুল ফিতর বিগত হলো। রণাঙ্গন আরো সরগরম হলো। যুদ্ধ তুমুল আকার ধারণ করলো। মুজাহিদরা নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করল। সামনের কাতারে সীসাঢালা প্রাচীর হয়ে সবাই লড়াই করছে, উপরে বোমারু বিমান, পিছনে ট্যাংক-কামান, সামনে অস্ত্রসজ্জিত কমাণ্ডো বাহিনী। তবু কোন ভয় নেই। নির্ভীক মুজাহিদ বাহিনী এগিয়ে চলেছে আল্লাহর সন্তুষ্টির রেখা অনুসরণ করে জান্নাতের পথে।

ওয়ারলেস সচল করা হলো। একের পর এক সংবাদ প্রচারিত হচ্ছে। চারপাশে সমবেত সবাই উৎকীর্ণ হয়ে শুনছে। হঠাৎ ভেসে আসল দুই শহীদের শাহাদাতের সুসংবাদ, তারা হল বশীর ও সুরাকা।

মানুষকে আল্লাহ যে স্বচ্ছ-সুন্দর স্বভাব দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। বশীর সেই সুস্থ স্বভাবের উপর অবিচল থেকেই দুনিয়ার জীবন যাপন করেছে। কোন রকম পঙ্কিলতা তার স্বভাবকে কলুষিত করতে পারেনি। তার প্রতিটি আচরণ ও উচ্চারণ ছিল দ্ব্যর্থহীন সুস্পষ্ট। অস্পষ্টতা ও কপটতার লেশমাত্র ছিল না।

শুরু জীবনে সে সালাফী ছিল। পরবর্তীতে দাওয়াতের কাজে জড়ায়। সেখান থেকে সরাসরি জিহাদের ময়দানে চলে আসে। সবশেষে আল্লাহ তাকে ৩রা শাওয়ালে শাহাদাতের সৌভাগ্য দান করেন।

হৃদয়ের স্বচ্ছতা ও আত্মার পবিত্রতার কারণে সঙ্গীসাথীরা তাকে "শুভ্র হৃদয়" উপাধিতে ভূষিত করেছিল। আল্লাহ তার শাহাদাতকে কবুল করুন। এবং আমাদেরকে তার সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাউসে একত্র করুন। আমীন।

আবু সুরাকা

পক্ষান্তরে আবু সুরাকা ছিল খুব অমায়িক একজন যুবক। তার মিষ্টি উচ্চারণ ও কোমল আচরণে মুহূর্তেই যে কোন পাষাণ হৃদয়ে জায়গা করে নেয়। অতি অল্প সময়ে সে শত্রুকে আপন করে নিতে পারে। তার এসব গুণের কথা শুনে মনে হতে পারে, সে বুঝি কথা বলতো খুব বেশী। না, বাস্তবে সে প্রয়োজন ছাড়া একটা কথাও বলে না। কিছু জানতে চাইলে হাতেগোনা শব্দে উত্তর দিয়ে দেয়। এক কথা বারবার জিজ্ঞাসা করলে সেও একই শব্দে একই উত্তর দেয়। এতে তৃতীয়বার প্রশ্ন করার আগ্রহ থাকে না। তার সবচে' বড় গুণ হলো দু'ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো মিষ্টি হাসি, যা সবার হৃদয় কেড়ে নেয়। শত চেষ্টা করেও তুমি তাকে রাগাতে পারবে না।

তার মিষ্টি হাসি তোমার সমস্ত ক্রোধ শুষে নেবে। পবিত্র মাহে রমযান, রহমত-মাগফিরাত-নাজাতসহ যখন তার জীবন থেকে শেষ বিদায় গ্রহণ করলো তখন সে নিজেও দুনিয়ার জীবন থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করলো। আফসোস! আমি তাকে শেষ বিদায় জানাতে পারিনি। তবে যারা তাকে শাহাদাতের পর দেখেছে তাদের বক্তব্য হলো- 'সারা জীবনের চিরচেনা সেই মিষ্টি হাসি মৃত্যুর পরও তার ঠোঁটে-মুখে লেগে ছিল।'

আল্লাহ যেন তার এই হাসি চিরস্থায়ী করে দেন। হাশরে, মিযানে, সীরাতে ও কাউছারে তার মুখের হাসি অম্লান রাখেন। সবশেষে জান্নাতের উপযুক্ত মাকামে জায়গা দান করেন। আমীন।

আবু যাহাবের বিদায়

সর্বাবস্থায় প্রশংসা আল্লাহরই। আল্লাহর রাস্তায় সিংহপুরুষেরা একে একে বিদায় নিচ্ছেন। তায়েফের বীর সেনা আহমাদ চলে গেলেন। তার এক সপ্তাহ পরই একই পথ ধরে বিদায় নিলেন বীরযোদ্ধা আবু যাহাব।

আলেকজান্দ্রীয়ার নিকটে সমুদ্র তীরে তার জন্ম। বহু আগে তার বাপ-মা সুদান থেকে এখানে হিজরত করেছিলেন সমুদ্রের উন্মুক্ত পরিবেশে জীবন যাপন করার জন্য।

এ এলাকার অধিবাসীদের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিলো, ভোগ-বিলাস, খেলাধুলা, গল্পগুজব, হাসি-ঠাট্টা। এগুলো করে সময় কাটানোর জন্য গ্রীষ্মকালে এখানে সমুদ্র উপকূলে দূরদুরান্ত থেকে পর্যটক এবং দর্শকদের আগমন হতো।

সেখানে সবকিছুই ছিলো, ছিলো না শুধু জিহাদ, আল্লাহমুখিতা এবং সংযমতা, তো এই অন্তসারশূণ্য পরিবেশে আবু যাহাবের জন্ম, স্বাভাবিকভাবে সেও একটু আনন্দপ্রিয় ছিলো, রসিকতা পছন্দ করতো, তবে সবার থেকে ব্যতিক্রম; তার মাঝে কৃত্রিমতা বলতে কিছু ছিলো না। জন্মগতভাবেই অনেক প্রতিভার অধিকারী ছিলো, ফলে সে এলাকাবাসীর অন্তরে জায়গা করে নিতে সক্ষম হয়েছিলো। যাদের অন্তর ছিলো অন্ধকারাচ্ছন্ন, বিপদাপদেও আল্লাহমুখী হতো না। মুসলমানদের উপর যে নির্যাতন চলছে এগুলো নিয়েও তাদের কোন মাথাব্যথা ছিলো না।

সে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষিবিভাগের ছাত্র ছিলো। কিন্তু তার ভিতরে ও বাইরে ইসলাম ছিলো, অন্তরে জিহাদী পয়গাম বড় যত্নের সঙ্গে লালন করতো, যৌবনের শক্তিসামর্থ এবং জান-মাল আল্লাহর রাহে কোরবান করার জন্য সদা ব্যাকুল ছিলো, সে দেখলো বর্তমানে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা সবচে' বেশী আফগানিস্তানে। কারণ আর কোথাও হয়তো এত ভীষণ যুদ্ধ চলছে না। আবু যাহাব প্রস্তুতি নিল, আফগানের টিকেট সংগ্রহ করলো। এজন্য তাকে কত শ্রম ব্যয় করতে হয়েছে, কষ্টক্লান্তি সহ্য করতে হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কারণ সে তো কোন ধনী পরিবারের সন্তান ছিলো না।

যুদ্ধের সরঞ্জামাদি নিয়ে আফগানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। সেখানে পৌঁছে এক জিহাদী কাফেলায় যোগ দিলো, যারা রাশিয়ার সিমান্তে তুখার নামক অঞ্চলে যাত্রা করছিলো। তখন তার আনন্দের কোন সীমা ছিলো না। দীর্ঘ প্রতিক্ষার পর আপন লক্ষ্যে পৌছার সুযোগ এসেছে। কবি বলেন-

মন যদি হয় উচ্ছাভিলাসী + লক্ষ্য পূরণে হাঁপিয়ে ওঠে সুঠামদেহী।

আবু যাহাবের সুঠাম দেহ ছিল না, তবে ছিলো জীবন্ত হৃদয়, জ্বালাময়ী অন্তর আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সেখানে আমদরিয়ার নিকটে তার দুই ভাই যাবিহুল্লাহ এবং আব্দুর রহমানের সঙ্গে অবস্থান গ্রহণ করলো। শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দেয়ার জন্য তার অন্তর ব্যাকুল ছিলো। জটিল ও সংকটপূর্ণ মুহূর্তেও তার চেহারায় ছিলো আনন্দের ছাপ, রহস্যের হাসি। যুদ্ধের ময়দানই ছিলো তার বাড়ি, তার বজ্র আক্রমণে বহু শত্রু নিহত হয়।

আবু যাহাব তুখার থেকে পেশওয়ার যাত্রা করে। এবং নানজারহারে রুশ বাহিনীর আক্রমণের সংবাদ শুনতে পায়, ফলে মুজাহিদ ভাইদের সাহায্যের জন্য সেখানে ছুটে যায় এবং বীরদর্পে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে যায়। পরিস্থিতি শান্ত হলে ভ্রাতৃদ্বয়ের সঙ্গে জাযি অঞ্চলে যাত্রা করে। সেখানে একটি নতুন ঘাঁটি তৈরী করে, যা ছিলো শত্রুশিবিরের মাত্র চার কিলোমিটার দূরে। এবং রাত দিন একাকার করে কাজ করতে থাকে।

আবু যাহাব-ই ছিলো মুজাহিদদের অতন্দ্রসেনা। কোরআনের হাফেয ছিলো, বলিষ্ঠ আওয়াজে কথা বলতো, বড় আবেগপূর্ণ কণ্ঠে কোরআন তেলাওয়াত করতো। সে আমাদের সঙ্গে ফজর পড়ে চলে যেত তার ঘাঁটিতে, এশার আগে ফিরতো না। সারাদিন সেখানে অসহনীয় ঠাণ্ডা বরফের মাঝে অবস্থান করতো। মুজাহিদদের এ দলটির কারো বয়স তেইশের উর্ধ্বে হবে না, কিন্তু শত্রুর সামনে তারা ছিলো একেকটি সিংহ।

আবু যাহাবের মত সাহসী যুবক আমি দেখিনি, তার আদব আখলাক এবং ইখলাস ও নিষ্ঠা ছিলো অতুলনীয়। নিষ্পাপ শিশুর মত সবার কাছে শাহাদাত লাভের দোআ চাইতো। কখনো তাকে হাসি মশকরা করতে

দেখিনি। বড়দের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলো। তবে মিষ্টি মজার কথা বলে সবাইকে আনন্দ দিত।

তাদের সবার মাঝে ছিলো পর্বতের অবিচলতা ইস্পাতের দৃঢ়তা। হাত পা অবশ করা শীতেও তাদের কর্মতৎপরতা থেমে থাকেনি। শত্রুর ঘাঁটি তারা উৎখাত করেই ছাড়বে। তাদের দুর্গগুলো জয় করেই ছাড়বে। এবং যে কোন মূল্যে কাবুলের পথ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতেই হবে। তাদের মাঝে ক্লান্তির লেশমাত্র ছিলো না। সর্বদা শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা, তাদের তথ্যসংবাদ আহরণ করা এবং আক্রমণের নতুন নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করা– এগুলোই ছিলো তাদের রাত দিনের ব্যস্ততা।

যুদ্ধের (বয়স) প্রায় দুমাস। আবু যাহাব তার পূর্বের ঘাঁটি থেকে এগিয়ে গেল। এবং শত্রু শিবিরের নাকের ডগায়, মাত্র দু'শ মিটার দূরে নতুন ঘাঁটি স্থাপন করলো। তার সঙ্গী আবু খালিদ বলল- আবু যাহাবের কষ্ট সাধনা দেখে আমার খুবই আশংকা হত অচিরেই সে আমাদেরকে ছেড়ে চলে যাবে।

প্রতিটি মুহূর্ত ছিলো তার ব্যস্ততার মুহূর্ত, তার চোখে ঘুম ছিলো না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আক্রমণের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করতো এবং ভারি ভারি অস্ত্র, ক্ষেপনাস্ত্র, ট্যাংক কামানগুলো সেই নিশানা অনুযায়ী তাক করে বসাতো। এভাবে তার কর্মতৎপরতা চলতে থাকতো। রাত দশটার আগে মুজাহিদ শিবিরে ফেরার সুযোগ হতো না। ফেরার পরও তার একটানা ঘুম হতো না। রাত একটার সময় জেগে যেত, সবাই তখন ঘুমে বিভোর, সে নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করতো।

আক্রমণের নির্ধারিত দিন এসে গেলো। আবু যাহাবের শাহাদাতের তামান্না আরো মজবুত হলো। কে জানে তকদীরে সত্যি কি আমার শাহাদাত লেখা আছে। নাকি এ তামান্না অপূর্ণই থেকে যাবে।

আবু যাহাব হতাশ হলো না, প্রস্তুতি কর্মতৎপরতা চালিয়ে গেলো। ঠিক এক সপ্তাহ পর ১৪০৭ হিজরী শাবান মাসের ২৬ তারিখে আসমান থেকে তার শাহাদাতের সৌভাগ্য নেমে এল। আছরের সময় হলো। নামাজ আদায়ের

জন্য একটি জায়গা পা দিয়ে পরিষ্কার করছিলো। হঠাৎ পায়ের নিচে মাইন বিস্ফোরিত হলো, ফলে তার হাঁটু পর্যন্ত একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। দুই সঙ্গী উসামা এবং শফিকও আহত হলো। আবু যাহাব শুধু মুখে জপছিলো حسبنا الله و نعم الوكيل আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ঠ। তিনি কত উত্তম কর্মবিধারক। তার হাত পা থেকে রক্ত ঝরতে ঝরতে এক সময় তার দেহ ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। তার রূহ জান্নাতের পাখি হয়ে উড়ে গেল। তার বহুদিনের তামান্না পূর্ণ হলো। শাহাদাতের সংবাদ চতুর্দিকে ছাড়িয়ে পড়ল। তাকে তুলে আনা হলো। তার পবিত্র দেহের পরশে ধন্য হলো আফগান ভূমি।

দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য তার চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিলো না। এটাই আল্লাহর দরবারে তার জন্য সাক্ষী হয়ে থাকবে।

বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে ইতিহাসের পাতায় অমরত্বের সাক্ষর রেখে গেলো আবু যাহাব। আফগানের মাটিকে সিঞ্চিতকারী তার রক্তের ফোয়ারা এই বার্তা জানায়, আমরা যেন জিহাদের গুরুত্ব ও মর্যাদা বুঝতে শিখি। আল্লাহর ডাকে সাড়া দিতে আমরা যেন বাবা মা বা অন্য কারো অনুমতির পরোয়া না করি। সবাইকে একই বার্তা জানিয়ে বিদায় নিলো আমাদের আবু যাহাব। তবে তার প্রশংসা ও আলোচনা এখনো জীবন্ত হয়ে আছে সবার মুখে মুখে। ক্ষত বিক্ষত হৃদয়ে সালাম জানাই তোমাকে হে আবু যাহাব। চিরস্থায়ী সুখের জান্নাতে দেখা হবে ইনশাআল্লাহ।

শহীদ ইয়াসার আবুন নুর

(তাকে আব্দুর রহীম আরজা নামে ডাকা হয়)

মুজাহিদদের সেবা কেন্দ্রে তার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা। উজ্জ্বল নূরানী চেহারা। ১৮ বছরের যুবক, পরিচয় জিজ্ঞাসা করলাম, বললো ফিলিস্তিনে আমার জন্ম। কিন্তু কুয়েতে বসবাস করি। পাকিস্তানে কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার নিয়তে এসেছিলাম, তবে আমার জিহাদ করার বড় আকাঙ্ক্ষা।

একটি জিহাদী কাফেলা বলখের অভিমুখে রওয়ানা হবে। হালকা পাতলা এই যুবকটি এই সুযোগটি হাতছাড়া করতে কিছুতেই রাজী নয়। আমি ভাবতেও পারিনি, এদের মত তরুণরা আফগান জিহাদে এই অসমান্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। জীবনে যারা কখনো কষ্টের মুখ দেখেনি। কঠিন কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করেও অভ্যস্ত নয়। জীবনের অলিগলি এখনো যাদের অচেনা, অজানা। তবে সবই আল্লাহর ইচ্ছা। ইখলাস ও নিষ্ঠা, দহন ও যন্ত্রণা যাদের অন্তরে আছে তাদের দ্বারা এ ধরনের দুর্লভ নমুনা পেশ করা সহজেই সম্ভব।

আব্দুর রহীম ইয়াসার সম্পর্কে আবু উসাইদের কাছে শুনলাম। সে তার সফরসঙ্গী ছিলো এবং বলখে কিছুদিন তার সঙ্গে ছিলো। বললো, আব্দুর রহীম সবার কাছেই প্রিয়, মুজাহিদরা তাকে অনেক ভালবাসে। কারণ তার মাঝে বিশেষ দুটি গুণ ছিলো। প্রথমত হৃদয়ের প্রশস্ততা এবং চরিত্রের মাধুর্যতা, যার কারণে সে সবার প্রিয় পাত্র হতে পেরেছিলো। দ্বিতীয়ত বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং শাহাদাতের প্রচণ্ড আগ্রহ। হাদীসের ইরশাদ অনুযায়ী– সর্বোত্তম মানুষ তো ঐ ব্যক্তি যে জিহাদের জন্য সদা প্রস্তুত; যখনই কোন বিকট আওয়াজ শুনে সেদিকে ছুটে যায় মৃত্যুর সন্ধানে।

"মাযার শরীফে" মুজাহিদ সংগঠনের আমীর মুহাম্মাদ আলম– ইয়াসিরকে "দেওয়ানা" বলে ডাকতো। তার ব্যাকুলতা এবং অস্বাভাবিক সাহসিকতার কারণে ইয়াসির যখনই কোন চিঠি লিখতো এভাবে নিজের স্বাক্ষর লিখতো- "মাযার শরীফে আরবের প্রথম শহীদ যার সামনে রয়েছে জান্নাতী হুর"।

যেখানেই লড়াইয়ের কথা শুনতো ছুটে যেত। তার অবস্থা তো এমন ছিলো যেন, লড়াইয়ের আনন্দে অশ্বপৃষ্ঠ হতে লাফিয়ে পড়বে। তার আত্মমর্যাদা যেন বলতো-

বড় মধুর লাগে মোর যুদ্ধের ধ্বনি আহবান,
এ মন নেচে ওঠে দেখে রক্তের কলতান।
সইবোনা অপমান, বিলিয়ে দেবো তুচ্ছ এ প্রাণ,
এ শির হবে না নত, করবো তাদের প্রত্যাখ্যান।

অধিক পরিমাণে কোরআন তেলাওয়াত করতো, সাধারণত প্রত্যেক সোমবার এবং বৃহস্পতিবার রোজা রাখতো। রাতের স্বপ্নগুলো তার স্পষ্ট স্মরণ থাকতো। কয়েকবার স্বপ্নে দেখেছে যে, সে শহীদ হয়ে গিয়েছে এবং হুরে আয়নাকেও দেখেছে। স্বপ্নগুলো পত্রস্থ করে তার আরব সাথীদের কাছে পাঠাতো।

তার জিহাদের সূচনা হয়েছিলো কোউনারে উসামার সেনাছাউনি থেকে। যেখানে সে আসাদুল্লাহর সাক্ষাতে আগমন করেছিল। এজন্য সে তার কথা অনেক বলতো এবং কোউনারের বিভিন্ন ঘটনা শুনতো।

শাহাদাতের তীব্র বাসনা ইয়াসিরকে অস্থির করে তুলল। তাই সে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিয়ে রণাঙ্গনের খোঁজখবর নিতে শুরু করলো। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তপ্ত মরুর ঝলসানো রোদ সহ্য করে ময়দানের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলো সংগ্রহ করল এ আশায় যে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের ঝলসানো আগুন থেকে মুক্তি দেবেন। দেখতে দেখতে আমরা রমযান (১৪০৬ হি.) এর শেষ দশকে পৌঁছে গেলাম। ছোট-বড়, ভাল-মন্দ মুমিন মাত্রই যে সময়ের অপেক্ষায় থাকে নিজেদের গোনাহ মাফ করানোর জন্য। খাঁটি দিলে তাওবা-ইস্তেগফার করে পাক-ছাফ হওয়ার জন্য। ইয়াসিরও আল্লাহর দরবারে দুআ করতে থাকল।

ইতিমধ্যে একটি অভিযানের সংবাদ আসল। ইয়াসির তার সহযোদ্ধাদের নিয়ে ঐ অভিযানে শরীক হওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হল। পথিমধ্যে শত্রুপক্ষের এক ঝাঁক ট্যাংক ও বিমান তাদের সবাইকে চারদিক থেকে ঘিরে

ফেলল। ইয়াসির আত্মরক্ষার যথাসাধ্য চেষ্টা করল। কিন্তু শুধু ওকে পাকড়াও করার জন্য একদল সৈন্য আসল এবং হ্যাণ্ডকাপ পরিয়ে হেলিকপ্টারের দিকে নিয়ে গেল। সে ঝটকা দিয়ে ছুটে দৌড়ে পালানোর চেষ্টা করলো। কিন্তু ওরা আবারো ধরে ফেলল। এবার হেলিকপ্টারে তুলে বন্দী করে রাখল। যখনই হেলিকপ্টার উড়াল দিলো, সঙ্গে সঙ্গে সে লাফিয়ে পড়ে এক বাগানে আত্মগোপন করল। বাগানের মালিক তাকে লুকিয়ে রাখল। কিন্তু কিছু মুনাফিকের সাহায্যে শত্রুবাহিনী তার অবস্থান জেনে গেল এবং বাগানের মালিককে নির্যাতন করে ইয়াসিরের সন্ধান লাভ করল। তারপর তারা ইয়াসিরকে রুশ বাহিনীর কেন্দ্র "মাজার শরীফ"-এ নিয়ে গেল।

ইয়াসিরের বন্দী হওয়ার সংবাদ মুজাহিদদেরকে বজ্রের মত আঘাত করল। কারণ মুজাহিদদের কাছে একশজন আফগান যোদ্ধার চেয়ে ইয়াসিরের মত একজন আরব মেহমানের মর্যাদা ও গুরুত্ব অনেক বেশী। তাই মুজাহিদ মুহাম্মাদ আলমসহ ১৬০০০ (ষোল হাজার) মুজাহিদ একজোট হয়ে ইয়াসিরের সন্ধান লাভের উদ্যোগ নিল। সবাই যখন এটা নিশ্চিত হল যে, সে রুশকেন্দ্রে বন্দী আছে তখন বন্দী বিনিময়ের আলোচনা শুরু করল। কারণ মুজাহিদদের হাতে একজন রুশ কমাণ্ডার বন্দী হয়েছিল।

তাদের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হলো। ইয়াসিরের বিনিময়ে আমরা তোমাদের কমাণ্ডারকে ছেড়ে দিতে রাজি আছি। কিন্তু তারা বলল, আমাদের কমাণ্ডারকে হস্তান্তরের জন্য তোমরা যতজন আফগান যোদ্ধা ফেরত চাইবে ততজনকেই ফেরত দিতে রাজি আছি। কিন্তু ঐ আরব যুবকটা ছাড়া। ওকে আমরা কোনোভাবেই ছাড়বো না। মুজাহিদ-আমীর মুহাম্মাদ আলম বললেন, তোমাদের কমাণ্ডারের বিনিময় একমাত্র ঐ আরবই হতে পারে। শেষ পর্যায়ে তারা জানাল, ঐ আরব যোদ্ধাকে হত্যা করা হয়েছে। তখন অনন্যোপায় হয়ে আমীর এগারজন মুজাহিদকে ফেরত চাইল কমাণ্ডারের বিপরীতে। অতঃপর বন্দী বিনিময় সম্পন্ন হল। এখন তাদের দাবী যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে আল্লাহর কাছে আমরা এ আশা করতেই পারি যে, তিনি ইয়াসিরকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করেছেন এবং সেখানে সে হুর-গেলমান নিয়ে পরম সুখে আছে। তাই যেন হয় হে আল্লাহ!

শহীদ সফিউল্লাহ আফযালী

১৪০৭ হিজরীর ১৫ই যিলক্বদের বিষণ্ন-বিমর্ষ বিকেলে বসেছিলাম পাহাড়ের কোলে। সারা দিনের ক্লান্ত সূর্যটা তখন ঢলে পড়েছে অস্তাচলে। সূর্য যেন তার সোনালী আলোর আভায় পৃথিবীটাকে বিদায়ী শুভেচ্ছা জানাতে চায়। এমন সুন্দর, তবে বেদনাবিধূর মুহূর্তে আমি বন্ধু আবু সাদিকের সঙ্গে কথা বলছিলাম। মুজাহিদ ভাইদের কোথায় কী জরুরত আছে তা শুনছিলাম। এমন সময় আবু সাদিক এমন এক সংবাদ দিল যাতে আমার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। আমার ভিতরটা তছনছ হয়ে গেল। বজ্রের আঘাতও হয়ত এর চেয়ে সহনীয় ছিল। সফিউল্লাহ আফযালী নাকি শহীদ হয়ে গেছে। কোনভাবেই আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি নিশ্চিত, সে শহীদ হয়ে গেছে, নাকি কারো মুখে শোনা কথা আমাকে শোনাচ্ছো? সে বলল, হ্যাঁ... সত্যিই সে শাহাদাতবরণ করেছে। কোন উপায়েই আর চোখের পানি রোধ করতে পারলাম না। আমার সমগ্র দেহ অবশ হয়ে আসল। শোকের আঘাত আমাকে আচ্ছন্ন করে ফেলল। নিজেকে আমি বোঝাতে পারছিলাম না– এমন তরতাজা একটা গোলাপ হঠাৎই কীভাবে ঝরে পড়ল! হেরাতের মরু উদ্যান যার শোভা-সৌরভে বিমুগ্ধ ছিল। এমন তেজদীপ্ত সিংহ হঠাৎ কিভাবে ঝিমিয়ে পড়ল। যার হুংকারে থরথর করে কাঁপত রুশ বাহিনী!

তুমি তো ছিলে হে সফিউল্লাহ্! হেরাতের হৃদয়ের স্পন্দন। যার অবর্তমানে থেমে যায় হৃৎকম্পন। তুমি ছিলে হেরাতের দেহে প্রবাহিত রক্তস্রোত যার নিস্তরঙ্গতা সমগ্র দেহকে নিস্তেজ করে দেয়। তুমি ছিলে হেরাতের গর্ব ও গৌরব, মর্যাদা ও সম্ভ্রম। আর তুমিই কিনা সবাইকে ফেলে এভাবে চলে গেলে; আল্লাহ যেন তোমাকে নবীগণ, ছিদ্দীকীন, শহীদান ও ছালেহীনের ছোহবত নছীব করেন। 'রফীক' হিসাবে তারা কত উত্তম!!

সফীউল্লাহকে জিহাদের পথে এনেছিল তার বড় ভাই হাফীযুল্লাহ আফযালী। তারা দুই ভাই কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল নক্ষত্র। বড় ভাই হাফীযুল্লাহ তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছে। পরবর্তীতে যখন বিপথগামী দাউদ হেরাত প্রদেশের গভর্নর নিযুক্ত হল এবং ইসলাম ও মুসলমানদের

স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হল তখন হাফীযুল্লাহ তার শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলন ও সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তুলল। এই বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হলেন সাইয়েদ নুরুল্লাহ। সরকার দিশেহারা হয়ে হাফীযুল্লাহকে গ্রেপ্তার করল। হেরাতের যমীনে তিনিই প্রথম বন্দী মুজাহিদ। পরবর্তী সময়ে জিহাদী আন্দোলনকে আরো বেগবান করার জন্য শায়েখ সাইফুদ্দীন নুসরতইয়ার হেরাতে গমন করেন এবং বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে মানুষকে দাউদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে থাকেন। এ সময় সশস্ত্র যুদ্ধের পতাকা ইঞ্জিনিয়ার হেকমতিয়ারের হাতে ছিল। তিনিই ছিলেন মুজাহিদদের সিপাহসালার ও সর্বাধিনায়ক। তিনি পুরো বাহিনীকে তিনভাগে ভাগ করেছিলেন। ড. মুহাম্মদ উমর-এর নেতৃত্বে বদখশান অঞ্চলে একটি বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। মওলবী হাবীবুর রহমানের তত্ত্বাবধানে লাগমান অঞ্চলে দ্বিতীয় বাহিনী এবং আহমাদ শাহ মাসউদী'র অধীনে পাঞ্চশেরের উদ্দেশ্যে তৃতীয় বাহিনী প্রেরণ করেছিলেন। হাফীযুল্লাহ ও ছফিউল্লাহ ছিল আহমাদ শাহের ইউনিটে। আহমাদ শাহ'র বাহিনী পাঞ্জশের দখল করার সময় বড় ভাই হাফীযুল্লাহ শাহাদাত বরণ করে। সে সময় ছোট ভাই ছফীউল্লাহর বয়স ছিল মাত্র ১৭ বছর। কিন্তু শৈশব থেকেই যেহেতু সে ইসলামী তালীম-তারবিয়াতের উপর বেড়ে উঠেছে এবং বংশগত ঐতিহ্য হিসাবে বীরত্ব, সাহসিকতা ও আত্মমর্যাদার উত্তরাধিকার লাভ করেছে তাই সে বড় ভাইয়ের রেখে যাওয়া অসমাপ্ত মিশনকে সুপরিণতি দান করার লক্ষ্যে জিহাদের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিল। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সেই ঝাণ্ডা সে সমুন্নত করে রেখেছিল।

হেরাত ট্রাজেডি

১৯৭৯ এর মার্চের কথা। হেরাতের ক্ষমতায় তখন রাশিয়ার মদদপুষ্ট সরকার। দেশ ও জাতির সঙ্গে গাদ্দারি করে, ইহুদী-খৃস্টানদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতায় বসেছে এক শ্রেণীর বখাটে। যাদের হাতে ইসলাম ও মুসলমানদের সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ বড় নির্মমভাবে বিলুপ্ত হয়ে চলেছে।

হেরাতের ইসলামপ্রিয় জনসাধারণ সেটা কোনভাবেই মেনে নিতে পারেনি। তাই তারা নওজোয়ান মুজাহিদ সফীউল্লাহর হাতে হাত রেখে আমৃত্যু জিহাদের শপথ গ্রহণ করল। শুরু হল তুমুল যুদ্ধ। সশস্ত্র সরকারী বাহিনীর সঙ্গে অনেকটা নিরস্ত্র মুজাহিদ বাহিনীর অসম লড়াই। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে গায়েবী নুসরতের কল্যাণে খুবই অল্প সময়ে মুজাহিদরা হেরাতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ ও অঞ্চল এবং সরকারী সমস্ত স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান দখল করে নিল। ১৫ই মার্চ সারা দেশের সর্বসাধারণ বিজয়ের আনন্দ মিছিল নিয়ে বেরিয়ে আসলো মহাসড়কে। আর তখনই ঘটে গেল ইতিহাসের জঘন্যতম ও নিষ্ঠুরতম হত্যাযজ্ঞ। রচিত হল নিজের দেশের জনগণকে বহিঃশত্রুর মাধ্যমে কচুকাটা করার কলঙ্কজনক নতুন এক অধ্যায়। বরফঢাকা বিশাল একটা প্রদেশকে মুহূর্তের মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে রূপান্তরিত করা হল। চোখের পলকে ৫২,০০০ (বায়ান্ন হাজার) নাগরিককে খুন করল তাদেরই দেশের সরকার। কিন্তু জাতিটা যেহেতু আফগান, রক্ত যাদের আরব, ধর্ম যাদের ইসলাম, তাদেরকে তো আর গণহত্যা দিয়ে দমানো যাবে না। সুতরাং সব ভুলে সবাই নতুন করে সংগঠিত হল। হেরাতের এই অসামান্য কুরবানীর বদৌলতে আল্লাহ তাদের জন্য বিশেষ নেয়ামত হিসাবে সফীউল্লাহকে ঐ হত্যাযজ্ঞ থেকে খাছভাবে বাঁচিয়ে দিলেন। নব উদ্যমে সবাই তার পতাকাতলে সমবেত হল। বড় ভাই হাফীযুল্লাহর রক্তের বদলার কথা ভুলে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য আল্লাহর শত্রুদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহনের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করল নওজোয়ান সিপাহসালার সফীউল্লাহ। মুরব্বী হিসাবে তাদের দূরদর্শী দিকনির্দেশনা দিচ্ছিলেন শায়েখ রাব্বানী। তার পরামর্শে মুজাহিদ বাহিনীকে কয়েকভাগে ভাগ করা হলো। যাতে চতুর্দিক থেকে একযোগে হামলা পরিচালনা করা যায়। ইতোমধ্যে সফীউল্লাহর আরেক বড় ভাই আযীযুল্লাহ যিনি বয়সে হাফীযুল্লাহর চেয়ে দুই বছরের বড় ছিলেন– তিনিও ছোট ভাই সফীউল্লাহর বাহিনীতে যোগ দিলেন। বয়সে তরুণ হওয়া সত্ত্বেও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর জোশ ও জযবা এবং রণকৌশল ও বিচক্ষণতার কারণে বিনা বাক্যে সবাই সফীউল্লাহকে সিপাহসালার হিসাবে গ্রহণ করল। প্রস্তুতি শেষ করে এবার সবাই রওয়ানা হল শত্রুর মোকাবেলায় রণাঙ্গনে।

হেরাতের প্রকৃতি

প্রাকৃতিকভাবে হেরাত প্রদেশটা যথেষ্ট সুন্দর। বিশাল-বিস্তৃত সমতল একটা মাঠের মত। এটা যে উঁচু উঁচু পাহাড়-টিলা, ঘন-গভীর, বন-জঙ্গল, আর দুর্গম গিরিপথ বিশিষ্ট আফগানিস্তানের প্রদেশ, কোনোভাবেই তা বিশ্বাস করা যায় না। অথচ অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত রুশ বাহিনীর মোকাবিলায় তুলনামূলক নিরস্ত্র মুজাহিদদের জন্য প্রাকৃতিক এই শক্তিগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ প্রদত্ত এই পর্বতগুলো মুজাহিদদের জন্য সুরক্ষিত দুর্গ যেখানে আশ্রয় নিয়ে তারা বছরের পর বছর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকে। প্রকৃতির সৌন্দর্য চিরসবুজ এই গভীর জঙ্গলগুলো তাদের জন্য বাংকার সমতুল্য। যেখানে আত্মগোপন করে খুব সহজেই ঘায়েল করা যায় শত্রুবাহিনীকে। আর মুজাহিদরা এভাবে যুদ্ধ করেই অভ্যস্ত। কিন্তু এবারের যুদ্ধক্ষেত্র হেরাত-এর প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে খোলা ময়দানে "খালি গায়ে" যুদ্ধ করতে হচ্ছে। আজো আমি ভেবে অবাক হই, এই ক্ষুদ্র একটা বাহিনীর পক্ষে কীভাবে সম্ভব হয়েছিল এমন ভয়ংকর পরিস্থিতি মোকাবিলা করে এত দীর্ঘ সময় টিকে থাকা। যেখানে রুশ বাহিনীর আক্রমণে একটা বাড়িও অক্ষত ছিল না। কোনো দেয়ালের উপরে ছাদ আস্ত ছিল না। হেরাতের একটা গ্রামে দুই হাজার বাড়ি ছিল। অথচ বহু তালাশ করে সেখানে একটা অক্ষত বাড়ি পাওয়া যায়নি। হেরাতের প্রকৃতিতে মুজাহিদদের জন্য আরেকটি বড় পরীক্ষা ছিল বিশাল বিশাল মরুভূমি। প্রায়শঃ মুজাহিদদেরকে তা অতিক্রম করতে হতো। যেখানে ওঁৎ পেতে থাকত রুশ বিমান ও হেলিকপ্টার। বাজপাখির মত তাদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। কখনো বা ভারি অস্ত্র নিয়ে লুকিয়ে থাকত একদল সেনা। মুজাহিদদের দেখামাত্র ব্রাশ ফায়ার করে নিমিষেই মিটিয়ে দিত। অনেক সময় শত্রুর চক্ষু এড়িয়ে গেলেও নির্জন মরুভূমিতে দিক হারিয়ে ক্ষুধা-পিপাসায় মৃত্যুবরণ করতে হতো। এতসব বৈরিতা ও প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে দীর্ঘ দশ বছর একটানা যুদ্ধ চালিয়ে গেছে সফীউল্লাহ ও তার ক্ষুদ্র বাহিনী। আর এটা সম্ভব হয়েছে শুধু এই কারণে যে তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর বাহিনী। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন– ألا إن حزب الله هم الغالبون শুনে রাখো, আল্লাহর বাহিনী, তারাই বিজয়ী হবে।

ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ

মুজাহিদ বাহিনীকে সমর্থন করার দায়ে হেরাতের জনগণের প্রতি রুশ বাহিনীর আক্রোশ সীমাহীন বেড়ে গেল। তাদেরকে কোণঠাসা করার জন্য সর্বউপায়ে মরিয়া হয়ে উঠল। এমনকি ঐ জানোয়ারগুলো হেরাতের প্রতিরক্ষা বাঁধ ভেঙে দিল। ফলে সমস্ত ফসলী জমি পানির নিচে তলিয়ে গেল। ফসল যা নষ্ট হওয়ার তা তো হলোই। জমিগুলোও চাষাবাদের অনুপযুক্ত হয়ে পড়ল। ফলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে সমগ্র হেরাতে ভয়ংকর এক দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। এক টুকরো রুটি তখন চাঁদ হাতে পাওয়ার মত কল্পকাহিনীতে পরিণত হল। সফীউল্লাহ বুঝতে পারল আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা চূড়ান্ত পরীক্ষা। সঙ্গী সাথীদেরকে সে ধৈর্য ধরার প্রতি উদ্বুদ্ধ করল। তখনও বিশ্বমানচিত্রে এই সৌদিআরব ছিল, কাতার-আমিরাত ছিল। তখনও লক্ষ-কোটি টন খাবার ডাস্টবিনে ফেলা হতো। কিন্তু আল্লাহর রাস্তার এই মুজাহিদদের পেটের আগুন নেভানোর জন্য এক টুকরো রুটি জুটতো না। তবু এই অসহায় মুজাহিদরা আল্লাহর পথ ছাড়েনি। সামান্য কিছু পনির আপদ-কালীন সময়ের জন্য সঞ্চিত রাখা হয়েছিল। সেগুলো খেয়ে কোনমতে জানটাকে মৃত্যুর হাত থেকে তারা বাঁচিয়ে রাখল। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত লবণাক্ততায় অনেকেই অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন চিকিৎসার জন্য তাদেরকে পেশোয়ারে পাঠানো হল। অবশেষে ধৈর্যের ফলস্বরূপ আল্লাহর সাহায্য নেমে আসল। এমনই হয়, আল্লাহর জন্য যারা কাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করেন। বিপদ দিয়ে ধ্বংস করে দেন না।

সফিউল্লাহর সাথীদের শাহাদাত বরণ

সফিউল্লাহ জিহাদের পথে তার এগিয়ে চলা অব্যাহত রাখল। তাই আল্লাহর পক্ষ হতে একের পর এক সাহায্যপ্রাপ্ত হতে লাগল। যখন সে তার আশেপাশে তাকাল; দেখল, পথের শুরুতে যারা তার সঙ্গে ছিল তাদের মধ্য হতে অল্প ক'জনই এখনো তার সাথে আছে, বাকীরা শাহাদাতের অমীয় সুধা পানে তৃপ্ত হয়েছে। দু'বছর আগে একজন গুরুত্বপূর্ণ সৈনিক বরং বলা যায়

তার ডান হাত কাজী আব্দুর রহীম রহমানী শাহাদাত বরণ করেছে, সে একই সাথে ফকীহ এবং বিশিষ্ট দাঈ ছিল, বলা যায় তাদের রূহানী পিতা ছিলো। তার শাহাদাত বরণে সফিউল্লাহ ও তার সাথীরা বড়ই শোকার্ত হয়ে পড়েছিলো। আরো শাহাদাত বরণ করেছে আব্দুল্লাহ জান, যে মিলিশিয়া কমাণ্ডার শের আগাকে হত্যা করেছিলো, যার মৃত্যুতে রুশ বাহিনীর ভীত কম্পিত হয়েছে। আরো শহীদ হয়েছেন "মামা" আব্দুল আলী, এবং ইঞ্জিনিয়ার শের আহমদ।

প্রায় এক বছর আগে রুশ বাহিনী সীমান্তগুলোতে প্রচণ্ড হামলা চালিয়েছিলো। সেখানের একটি ঘাঁটিতে সফিউল্লাহর চাচাত ভাই কাসিম কমাণ্ডার হিসাবে ছিল। এই হামলায় সে শাহাদাত বরণ করেছিলো। তখন "হিযবে ইসলামী" এর খলীফা সুবহান গিয়ে সফিউল্লাহকে বলল, "আমি আপনার সৈনিকদের মধ্য হতে একজন। ক্বাসিম আমাদের সবার প্রতিনিধিত্ব করেছে।" সফিউল্লাহ লড়াইয়ের ময়দানে ছিল না। যখন সে ক্বাসিমের শাহাদাতের সংবাদ পেল এবং জানতে পারলো যে, তার ঘাঁটি "শিশমারীন" তার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন তাহির নামক এক মুজাহিদকে সঙ্গে করে সে "দাওয়াবের" উদ্দেশ্যে রওনা করল। এদিকে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়তো। সেখানে পৌঁছে সে লড়াই করতে করতে ঘাঁটি উদ্ধার করল। সেখানেই আছর আদায় করল। এভাবে খোলা ময়দানে রুশ বাহিনীর মোকাবিলা করা খুব সহজ ছিলো না।

তার চাচাত ভাই আতিক্বুল্লাহর শাহাদাতবরণ

এই আতীক্ব নিজেকে আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছিলো। সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো হেরাতের বাজারে বাজারে গিয়ে সে প্রতিদিন একজন রুশ সেনাকে হত্যা করবে। তার পিতা চাচ্ছিল আতীক্বকে বিবাহ দিবে। তাই মিষ্টি কেনা হলো। নির্ধারিত দিনে আতীক্বুল্লাহ শহীদ হয়ে বাড়িতে পৌঁছলো আর তার শাহাদাতবরণের আনন্দে সেই মিষ্টি বিতরণ করা হলো। সে "দাওয়াবে" শহীদ হয়েছে, তখন সে রোযাদার ছিলো।

"কুযল ইসলাম" বিজয়

"কুযল ইসলাম" হলো কাফেরদের একটি দূর্গ। সমাজতান্ত্রিকরা এটাকে শক্তিশালী কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলেছিল। এর চারপাশে বিরাট গর্ত খোঁড়া হয়েছে এবং খুব মজবুতভাবে সিমেন্ট দিয়ে বিরাট বিরাট দেয়াল তোলা হয়েছে। ফলে ঐ দূর্গে প্রবেশ করা আগ্নেয়গিরিতে ঢুকে পড়ার মতই কঠিন। কিন্তু এসবের পরোয়া না করে সফিউল্লাহ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মোহাম্মদ ইসমাঈল খান হিযবে ইসলামীর নেতা খলীফা সুবহানের সাথে তাতে অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিল। তারপর হঠাৎ একদিন তারা একযোগে দূর্গের উপর হামলা করল। সফিউল্লাহ ছিল অগ্রগামী বাহিনীতে, সে মাটির নিচ দিয়ে দেয়াল পার হচ্ছিল এবং চিৎকার করে রুশ বাহিনীকে আত্মসমর্পণের আহ্বান জানাচ্ছিল। এমন সময় এক সৈন্য তার সামনে পড়ে গেল। তার হাতে রিভালভার ছিল। সফিউল্লাহকে দেখে সে বলে উঠল, কে তুমি? সফিউল্লাহ বলল, আমি সফিউল্লাহ। তখন সৈন্যটি বলে উঠল, তুমিই আমাকে বন্দী করে নাও, তোমার হাতে ধরা পড়া অন্য কারো হাতে বন্দী হওয়ার চেয়ে উত্তম। এটা ছিল সফিউল্লাহর শাহাদাত বরণের প্রায় চার মাস আগের ঘটনা।

ফকীর আহমাদের শাহাদাত বরণ

বিশ বছরের টগবগে যুবক আহমাদ। বয়সে আমাদের অনেকের ছোট হলেও তার ব্যক্তিত্ব ছিল অসাধারণ। বড় বড় কমাণ্ডাররা তাকে পরম ভক্তি ও সীমাহীন শ্রদ্ধা করত। বীরত্ব ও সাহসিকতায় তার কোন তুলনা নেই। যুদ্ধ যখন ভায়বহ আকার ধারণ করতো তখনও সে ভীষণ সাহসিকতা ও পূর্ণ উদ্দীপনার সাথে ময়দানে অবিচল তাকতো। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন। এবং জান্নাতের উঁচু মাকাম নছীব করুন- আমীন।

আহমাদ সম্পর্কে আমীরের অভিব্যক্তি—

"আমি অনেকবার তার কাছে বসেছি। তাকে খুব কাছ থেকে দেখেছি। সবসময় তাকে মনে হতো মক্তবে উস্তাদের সামনে দোজানু হয়ে বসা

একজন ভদ্র ছাত্র। কথা-বার্তা খুবই কম বলতো। কেউ কথা বললে অত্যন্ত মনোযোগসহ শুনতো, কথার মাঝে কোন কথা বলতো না। কিছু জিজ্ঞাসা করলে অল্প কথায় জবাব দিয়ে দিতো। কথা বললে মনে হতো মুখ থেকে মুক্তা ঝরছে।"

একবার আমরা সবাই এক মজলিসে একত্র হলাম। ফকীর আহমাদ যেখানে কিছু কথা বললো, তার জাদুময় বক্তব্য সবার হৃদয়ে এতটাই প্রভাব বিস্তার করলো যে, আমাদের একজন আত্মহারা হয়ে নিজের মূল্যবান সুন্দর সাদা জুব্বাটি খুলে তাকে পরিয়ে দিল। তারপর দু'হাতে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, আফসোস, এই মুহূর্তে আমার কাছে এরচেয়ে মূল্যবান কিছু নেই। তোমাকে যদি আরো অনেক কিছু দিতে পারতাম!

এতটা বিনয়ী হওয়া সত্ত্বেও শত্রুরা তার নাম শুনলেই ভয় পেতো। তাই তার প্রতি শত্রুদের ছিলো চরম বিদ্বেষ। কিন্তু ভীতিটাই ছিল প্রবল।

একবার তার সামনে এসে এক শত্রুর হাত ভয়ে অবশ হয়ে গেল, তখন সফীউল্লাহ এগিয়ে গিয়ে তার হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে নিল।

আমার অস্ত্র আসবে শত্রুর হাত থেকে

ফকীর আহমাদ প্রায়ই বলতো, আমার কারো অস্ত্র-সহযোগীতার প্রয়োজন নেই। কারণ শত্রুর হাত থেকে আমি অস্ত্রভাণ্ডার গণীমত হিসাবে লাভ করি। শহীদ হওয়ার কিছুদিন আগেও তাকে কমিউনিস্টদের দুইটি গ্রামে অভিযানে পাঠানো হল। দুইটি গ্রামই আত্মসমর্পণ করলো। এ ছাড়াও এক বছর আগে শুধু হাবাতেই আট মাসে আহমাদ ছোট-বড় সব মিলিয়ে দু'শ ষাটটি অস্ত্র গণীমতরূপে লাভ করেছে।

অমায়িক ব্যক্তিত্ব

যেই তার সাথে চলতো সেই তাকে ভালবেসে ফেলতো, কথা শুনলে শুনতেই মন চাইত। সাইয়্যিদ নুরুল্লাহ ইমাম তার সম্মানে এক নৈশসভার

আয়োজন করেছিল। সেখানে আরব এবং আফগান একদল যুবক উপস্থিত হয়েছিলো। আহমাদ সেখানে মুগ্ধতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলো। পেশওয়ারে সবার মুখে মুখে শুধু তার কথাই শোনা যাচ্ছিল। তার প্রতি আমরা এতটাই মুগ্ধ ছিলাম যে, আমার 'উপদেশমালা' বইটি তার ছবি দিয়ে ছাপা হয়েছিলো।

নিকটবর্তী সময়ে আরো যারা শহীদ হয়েছেন

আহমদের সাথে থাকতো মুহাম্মাদ নামে এক তুর্কী মুজাহিদ, যে যখনই আহমদের দিকে তাকাতো তখনই বলতো, তুমি শহীদ হবে। তার কথাই বাস্তব প্রমাণিত হলো। মুহাম্মদ তার আগেই শাহাদত বরণ করেছিল। তার মাত্র পাঁচ মাস পরেই আহমাদ শাহাদাত বরণ করলো। ইনশাআল্লাহ জান্নাতে তারা একত্রিত হবে। শাহাদাতের কয়েকদিন আগে সাইয়্যিদ নুরুল্লাহ আহমাদকে বলেছিল, কতবার তোমার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু, তোমাকে তো পাওয়াই যায় না। উত্তরে আহমাদ বলল, ফ্রন্টের গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রশস্ত্র বহনের জন্য গাধা ভাড়ায় ব্যস্ত ছিলাম। নুরুল্লাহ বললো, রুশরা তাদের অস্ত্রভাণ্ডার, মজুদ খাদ্য-পানীয় বিমানে করে বহন করে, আর তুমি তা গাধায় করে বহন করো। আহমাদ বললো, শীঘ্রই আমরা রুশদের পরাজিত করবো আর বিমানগুলো হস্তগত করবো আমাদের গাধা দিয়ে। আহমাদ আরো বললো, আমি শাহাদাতের ঘ্রাণ পাচ্ছি। খুব শীঘ্রই আমি শহীদানের সাথে যুক্ত হবো। এই অনুভূতি তার সমগ্র সত্ত্বাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো। দিনগুলো চোখের পলকে কেটে গেলো, জীবনের আর কিছুই যেন বাকী ছিল না। আখেরাতের শিহরণ জাগানো বাতাস যেন প্রাবহিত হওয়া শুরু করেছিল।

ঘর ভাড়া নেয়ার ঘটনা

বিভিন্ন অভিযানে তার এত এত সফলতা এবং সবার মুখে মুখে তার প্রশংসার কথা শুনে মনে হতে পারে, আহমাদ হয়ত আড়ম্বরপূর্ণ জীবন

যাপন করতো। কিন্তু বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শুনলে সবার মুখ হা হয়ে যাবে। আরো চারটি পরিবারের সাথে পাঁচ-ছয় কামরার একটি ঘর সে ভাড়া নিয়েছিল মাসে পাচশ' রুপির বিনিময়ে। বাড়িটাও খুবই নিম্নমানের, দেয়ালে শ্যাওলা পড়ে গেছে। দেখলে মনে হয় নর্দমা। তার এক সহযোদ্ধা তাহের এ বিষয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, আহমদের পরিবারের জন্য ভালো একটা ঘর ভাড়ার ব্যবস্থা করুন। ঐ বাড়ীতে থাকলে সে রোগাক্রান্ত হয়ে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পিছিয়ে পড়তে পারে। তাই আমরা তার জন্য এবং তার তত্ত্বাবধানে থাকা অন্যান্য পরিবারের জন্য এক হাজার রুপি ভাতা নির্ধারণ করে দিলাম। তখন আহমাদ বলেছিল, আমি অসুস্থ। আশংকা হচ্ছে যে, আমি বিছানায় শুয়ে শুয়েই মৃত্যুবরণ করব। কিন্তু একজন মুজাহিদের জন্য বিছানায় শুয়ে শুয়ে মৃত্যুবরণ কলঙ্কজনক। তাই আমি অবশ্যই লড়াইয়ের ময়দানে যাবো। এবং সে গেল, আর আল্লাহর ইচ্ছায় শাহাদাত লাভ করল।

আহমাদ দীর্ঘ আট বছর যাবৎ যুদ্ধক্ষেত্রে আসা-যাওয়া করেছে, কোন রণক্ষেত্রে গেলে সবসময় প্রথম কাতারে থাকত। যেখানেই যুদ্ধ ভয়াবহ আকার ধারণ করত সেখানেই ছুটে যেতো। এতকিছু সত্ত্বেও সে কোনদিন আহত হয়নি। এই দীর্ঘ সময় আল্লাহ তার দেহকে হেফাজত করেছেন। ফলে সে শাহাদাতবরণের আগ পর্যন্ত পূর্ণ ছিহহাত ও আফিয়াত তথা সুস্থতা ও সুস্বাস্থ্য ভোগ করে গেছে।

রমযানের ঘটনা

শত্রুরা রমযান মাসে তার বিরুদ্ধে এক গুপ্তহামলা পরিচালনা করেছিল। তারা তার গাড়ীতে বোমা ফিট করে রেখেছিল। কিন্তু বিস্ফোরনের সময় সে তারাবীর নামায পড়ছিল। ফলে আল্লাহ তাকে নিরাপদ রাখেন।

শেষ বিদায়

শত্রুরা সফিউল্লাহ ও আহমাদের বিরুদ্ধে সম্মুখযুদ্ধের দুঃসাহস কখনোই করেনি, বরং সর্বদাই চোরাগুপ্তা হামলায় তাদেরকে ঘায়েল করতে চেয়েছে। ৭/৭/১৯৮৭ইং তে তাদের গাড়ীর উপর প্রচণ্ড গুলিবৃষ্টি হয়। ফলে গাড়ী

উল্টে যায় এবং তারা দু'জনই শহীদ হয়। এভাবেই সেই মহান মুজাহিদদ্বয় চলে গেলেন যারা রুশদের পায়ের নিচের মাটি কাঁপিয়ে দিয়েছিলো। অবশেষে সকলকে শোকের সাগরে ডুবিয়ে তারা চলে গেলো। সকল মুজাহিদকে শোকের সাগরে ডুবিয়ে তারা চলে গেলো। সকল মুজাহিদ তাদের শোকে কাঁদল, নারী মুজাহিদরা কাঁদল। সাইয়িদ নুরুল্লাহর চোখ কাঁদতে কাঁদতে ভীষণ ফুলে গিয়েছিল। আমরা আল্লাহর কাছে দোয়া করি, তিনি যেন আমাদেরকে জান্নাতুল ফেরদাউসে একত্রিত করেন।

কবিতা-

যা আছে আমার সব উৎসর্গ করলাম,
ঐ অশ্বারোহীদের জন্য যারা আমার ধারণাকে সত্য করে দেখিয়েছে।
ঐ অশ্বারোহীদের জন্য যারা মৃত্যুকে করে না ভয়,
যখন বেজে উঠে ভয়ংকর যুদ্ধের ডংকা।

অমর শহীদ উসমান

অন্তরে তখনো হজ্বের স্বাদ অনুভব হচ্ছিল। হৃদয় যেন তখনো তাওয়াফ করে চলেছে। চোখের পাতায় ভেসে উঠছে হজ্বের চিত্রগুলো। বারবার চোখের পাতায় ভেসে উঠছে আমাদের তাঁবু, মসজিদে নামিরাহ, মসজিদে খায়ফ, মসজিদে হারামের আকাশচুম্বী মিনারগুলো, বিভিন্ন দেশ থেকে আসা প্রতিনিধিদল, যারা বিশেষভাবে আফগানিস্তানের খবরাখবর জানতে এসেছিল- এসব ছবি ও চিত্রগুলো তখনো আমার হৃদয়জগত আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

সে সময় পেশওয়ারের ডক্টর আবু হুযায়ফার সাথে যোগাযোগ করলাম আফগানিস্তানের খবরাখবর জানার জন্য। আর তিনি আমাকে খুবই দুঃখের একটি সংবাদ শুনালেন, তিনি খালিদ আল-কারদী (উসমান) এর শাহাদাতের খবর দিলেন। এর এক কি দুইদিন পর তারা আমাকে সাইয়িদ আল-কুলাশী (আব্দুল মান্নান) এবং সাইয়িদ মুহাম্মাদ আব্দুল মাজিদ এর

শাহাদাতের খবর দিলেন। এভাবে কেন্দ্রের তিনজন বীর যোদ্ধা একত্রে বিদায় নিলেন। তাদের মৃত্যুতে কেন্দ্রীয় শক্তির ভীত নড়ে উঠল। এই ঘটনা ছিল আমার হৃদয়ের এমন গভীর জখম, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানেও যেখানে সামান্য সান্ত্বনার প্রলেপ পড়েনি।

আল্লাহর কুদরতের কারিশমা বোঝা বড় মুশকিল। আলোচ্য তিন শহীদের প্রত্যেকেই আল্লাহর ঘর যিয়ারত করতে চেয়েছিল। কিন্তু পথের বিপাদপদ তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল, যে কারণে তাদের আর আল্লাহর ঘর যিয়ারত করা হলো না। এমনকি তারা বিবাহের প্রস্তুতিও নিয়েছিল। আব্দুল মান্নানের বিবাহের আলোচনা চলছিল। আব্দুর রহমান শুধু নিয়ত করেছিল। আর উছমান তো সবসময়ই বলতো, বিবাহ হচ্ছে ফরয। সুতরাং আমি অবশ্যই বিবাহ করতে যাবো। এবং বিয়ের পর পুনরায় ফিরে আসবো। কিন্তু তাদের আর বিবাহ হলো না। মনে পড়ে কোরআনের আয়াত- "আর আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যা ইচ্ছা নির্বাচন করেন, তাদের কোন ইচ্ছাধিকার নেই।"

তিনজন কত চেষ্টা করল পেশওয়ার পৌছতে, সেখান থেকে প্রথমে হজ্বে যাবে, তারপর বাড়িতে গিয়ে বিবাহ করবে। কিন্তু বান্দা নিজের জন্য যা নির্বাচন করে আল্লাহ তার চেয়েও উত্তম কিছু তার জন্য নির্ধারণ করে রাখেন। তারা সফর করতে চেয়েছে আল্লাহর যিয়ারতের পিপাসা নিবারনের জন্য। কিন্তু আল্লাহ আপন দিদারে তাদের তৃষ্ণা মেটালেন। আল্লাহর কাছে আমরা আশা রাখি জান্নাতই হবে তাদের চির সুখের আবাস। যেখানে আল্লাহর সন্তুষ্টি হবে তাদের সঙ্গী। তারা চেয়েছিল দুনিয়ার কিছু নারীর সঙ্গ যাদের যাবতীয় খরচপাতি ও ভরণপোষণের দায়িত্ব নিতে হতো। কিন্তু আল্লাহ তাদের প্রত্যেককে বাহাত্তরজন আয়াতলোচনা হুরের সঙ্গে বিবাহ দিলেন, যাদের বিবাহে কোন ব্যয়ভার নেই। কোরআনের ভাষায় তারা হলেন- "উত্তম নারীগণ, সৌন্দর্যের আধার, সবসময় স্বামীদের সাথে থাকতে যারা পছন্দ করে। তদুপরি জান্নাতে তাদের জন্য রয়েছে এমন সব নায-নেয়ামত যা তাদের চক্ষু শীতল করে দেবে।"

কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে করতে তারা বড়ই পেরেশান হয়ে পড়েছিল। তাই আল্লাহ তাদেরকে পৌছে দিলেন চির শান্তির ঠিকানা জান্নাতে, যেখানে তাদেরকে পরানো হবে সবুজ রেশমী পোশাক, বসানো হবে তাদেরকে সারিবদ্ধ তাকিয়ায় মুখোমুখি করে। আর তারা পরস্পর খোশগল্পে মগ্ন থাকবে।

তারা চেয়েছিলো আইয়ামে তাশরীকে মীনায় উপস্থিত হয়ে হাদীর পবিত্র যাবীহার গোশত আহার করতে। কিন্তু আল্লাহ তাদের জন্য ইন্তেজাম করলেন তার চেয়ে সম্মানজনক মেহমানদারি।

প্রকৃতপক্ষে এরা ছিলো মানুষের সূরতে কিছু ফেরেশতা। তাদের স্বপ্ন, তাদের আকাঙ্ক্ষা, তাদের প্রতিটি বাক্য, প্রতিটি পদক্ষেপের ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে আছে মুসলিম উম্মাহর জন্য দরদ-ব্যথা। তাদের নির্মল স্বপ্নগুলো পবিত্র ফুলের মত। যখন তাতে বাস্তবতার ছোঁয়া লাগে তখন তা সুগন্ধি ছড়ায়।

একসময় তারা আর দশজন মানুষের মত সাধারণ সুখের জীবন যাপন করতো। একদিন হঠাৎ তাদের দৃষ্টি পড়ল মুসলিম জনগোষ্ঠীর দুর্দশার উপর। তারা লক্ষ করল, বিশাল মুসলিম উম্মাহ বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। আর কাফের-মুশরিকরা সুযোগসন্ধানী নেকড়ের মত তাদের উপর হামলে পড়ছে। এবং তাদেরকে ছিঁড়েফেড়ে খাচ্ছে। তখন তারা সজাগ হল। এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দের জীবনকে বিদায় জানিয়ে হিংস্র হায়েনাদের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবং লড়াই করতে করতে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করল। আর চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্ত হল।

জুলুমের আঁচড়ে আঁচড়ে আমাদের কলিজা ক্ষত-বিক্ষত, সেই থাবাগুলোতে লেগে আছে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার অবশিষ্টাংশ। তারাই সেই যুবকদল, যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণকে ভালবেসেছে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে, সর্বোত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে, ঘোড়ার পিঠে চড়ে খুঁজে বেড়ায়। যেখান থেকেই কোন আর্তনাদ ভেসে আসে এবং যেখানেই কোন বিকট আওয়াজ শুনতে পায় সেখানেই তারা ছুটে যায়। আর

তার অন্তর সর্বদা মৃত্যুকে খুঁজে বেড়ায়। যেখানেই তারা শহীদি মৃত্যুর ঘ্রাণ পায় সেখানেই ছুটে যায়। এবার আমরা এই তিন শহীদের জীবনচরিত আলোচনা করব।

শহীদ উছমান

মদীনা মুনাওয়ারার পবিত্র ভূমিতে ছাওর পর্বতের কোলে ছোট্ট এক পরিবারে খালিদের জন্ম। এখানেই সে শৈশব, কৈশর, যৌবনের দিনগুলো কাটিয়েছে। মদীনার উঁচু-নিচু টিলা আর পর্বতমালার মাঝে সে ঘুরে বেড়াতো। কখনো উঠতো উহুদ পাহাড়ে, কখনো চলে যেত আকীক ও বাত্বহা উপত্যকার মাঝে। ঘুরে-ফিরেই তার চোখে ভেসে উঠতো সাহাবায়ে কেরামের চেহারা। মদীনার প্রতিটি বালুকণা, প্রতিটি খেজুর বাগান ও বৃক্ষ, প্রতিটি টিলাভূমি তার মাঝে জাগিয়ে তুলতো সেই উজ্জ্বল ইতিহাস রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার সাহাবাগণ যাতে তাদের ঘাম আর রক্তের ছাপ রেখে গেছেন।

মসজিদে কোবা, কা'ব ইবনে আশরাফের প্রাসাদ, বনী কুরাইযার আবাসগৃহ, সব যেন তার সামনে ভাস্বর হয়ে ওঠে বর্তমানরূপে, যা তার পথের সব বাধা-বন্ধন, আর চলার পথের সব ক্লেশ-ক্লান্তি দূর করে দেয়। এভাবে খালিদ একসময় বিদ্যালয়ে পা রাখল।

যখন সে উচ্চ মাধ্যমিকে উপনীত হল তখন থেকে তার কানে আসতে লাগল গুলির আওয়াজ আর কামানের গর্জন, যা বহুদূরে সেই রণাঙ্গনের পর্বতমালায় বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল। সেই আওয়াজ আর গর্জন, তার ঘুম হারাম করে দিল। এবং তার মাঝে সৃষ্টি করল ক্ষোভ ও ক্রোধের এক অগ্নিকুণ্ড। কিন্তু নিজের ইচ্ছা পূরণে তাকে দীর্ঘ একটা সময় অপেক্ষা করতে হলো। তারপর যখন তার উস্তাদ জিহাদে বের হলো তখন খালিদ তার সঙ্গে সফর করল।

১৪০৫ হিজরীর রমযানে আমার ক্যাম্পে খালিদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমার নাম কি? বলল, খালিদ। আমি বললাম, বরং তোমার নাম উছমান হওয়া উচিৎ। কারণ তোমার স্বভাব সুলভ লাজুকতা আমাদেরকে সাইয়িদুনা উছমান রা.-এর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তার চেহারায় সর্বদা শিশুর সরলতা পরিলক্ষিত হতো। কোন প্রকার কৃত্রিমতা তার ভিতরে ছিল বলে মনে হয় না। রমযানের পর সে পূর্ণরূপে জিহাদে যোগ দিল।

কাবুলের পথে

তারপর সে কয়েক মাস আমার ফ্রন্টে ছিল। অতঃপর আবার মদীনায় ফিরে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল। কিন্তু যে হৃদয়ে একবার জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর গুরুত্ব, মহত্ব ও ভালোবাসা প্রবেশ করেছে সে হৃদয় তো জিহাদবিহীন জীবন কল্পনাও করতে পারে না। তার দেহ যেখানেই পড়ে থাকুক না কেন, মদীনার পবিত্র ভূমিতে কিংবা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসে; ভালোবাসার ডানায় ভর করে সে তার উদ্দেশ্যপানে ছুটে যাবেই যাবে। খালিদের অবস্থাও তাই হল।

সে মানুষের সাথে মেলামেশা ছেড়ে দিল। সবার মাঝে থেকেও যেন সে নেই। তারপর একটি জরাজীর্ণ পুরোনো বাড়ী ভাড়া নিল। দেখলে আবু যর গিফারীর রা. বাড়ীর কথা মনে পড়ে যায়। দুনিয়ার লোকদের শোরগোল থেকে দূরে, তাদের সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে সে ঘরকেই তার "ই'তেকাফ খানা" বানিয়ে নিল। তার দেহ পড়েছিল মদীনার যমীনে। কিন্তু অন্তর ঘুরে বেড়াত কাবুল-কান্দাহারের রণাঙ্গনে। আফগানিস্তানের স্মৃতি তাকে ধীরে ধীরে উতলা করে তুলল। শেষ পর্যন্ত তার পক্ষে আর মদীনায় থাকা সম্ভব হল না। তাই দ্বিতীয়বার সে জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হলো।

খালিদ যখন রণাঙ্গনে পৌঁছল তখন বীরত্ব ও সাহসিকতার সেই ইতিহাস আমাদের স্মরণ করিয়ে দিল যুগ যুগ ধরে যা খালিদ-তারেকের অনুসারীদের শোনিত ধারায় প্রবাহিত হয়ে আসছে। সারাক্ষণ সে আবৃত্তি করত–

"আমি বিলম্ব করলাম, জীবনকে দীর্ঘ করতে চাইলাম
কিন্তু দীর্ঘ জীবনের কোন ফায়দা নেই।"

সময়ের বিবর্তনে অল্প সময়ের মধ্যেই উছমান তার সাহসিকতা, একনিষ্ঠতা ও কর্মদক্ষতার মাধ্যমে কেন্দ্রের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হল।

উছমান নামের প্রতি খালেদের ভালোবাসা

মাঝে মাঝে আমি তাকে মশকরা করে বলতাম, উছমান না খালেদ? সে বলতো, উসমান। এ আমার গর্বের উপাধি। কেননা আপনি আমাকে এ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। কখনো আমি তাকে ভুলে হে উছমান বলে ডাকতাম। পরক্ষণেই ভুল স্বীকার করে তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, রাগ করেছো? সে নিঃসঙ্কোচে বলত, আমি কি মূর্খ যে অকারণে ক্রুদ্ধ হবো? আমি সান্ত্বনার জন্য তাকে জিজ্ঞাসা করতাম, মদীনায় ফিরে যাবে না? সবসময় তার এক জবাব, "যতদিন বেঁচে আছি জিহাদের ময়দান ছেড়ে কোথাও যাবো না।"

তার প্রতি উসামার ভালোবাসা

আমি শাওয়ালের যুদ্ধে উসামার সাথে ছিলাম। যখন যুদ্ধ ভীষণ আকার ধারণ করল তখন উসামা বলল, উসমানকে আমাদের কাছে ডেকে পাঠাও। সে আমাদেরকে পাহারা দিবে। এবং আমাদের জন্য খাবার তৈরী করবে। আমরা চাই যে, উসমান আমাদের সাথেই থাকুক।

শাহাদাতবরণ

কোন এক অভিযান শেষে দুই মুজাহিদ আব্দুল মান্নান ও আব্দুর রহমানের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। তখন আমীর উসামা তাদের সন্ধানে একটি

দল পাঠালো। উসামানও সেই দলে ছিল। কারণ ঐ এলাকা সে খুব ভালোভাবে চিনত। ঐ এলাকায় পৌঁছে উছমান ডক্টর সালিহের সঙ্গে সন্ধানে বের হল। যখন তারা একটি মোড়ে গিয়ে পৌঁছলো তখন মাটির নীচে পুঁতে রাখা মাইন বিস্ফোরিত হল। সঙ্গে সঙ্গে পা উড়ে গেল, পেট ফেটে গেলো এবং হাতেও সামান্য আঘাত পেল।

শহীদের মৃত্যুকষ্ট সামান্য কাঁটা বিঁধার মত

শহীদ অস্ত্রের আঘাতে ঐ পরিমাণ কষ্ট অনুভব করে একজন সাধারণ মানুষ খেজুরের কাঁটা বিঁধলে যেমন কষ্ট অনুভব করে। উছমানের ক্ষেত্রেও এমনটিই ঘটেছিল। তার পা তো প্রায় অর্ধেক গোছাসহ উড়ে গিয়েছিল। এবং পেট ফেটে নাড়ি-ভূড়ি বের হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ডাক্তার সালিহ যখন তার নাড়ি-ভূড়ি যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে পেট সেলাই করার চেষ্টা করছিল তখন উছমানের করুণ অবস্থা দেখে তার চোখে পানি এসে গেল। তখন উসমান বলল, ডাক্তার সাহেব! কান্নার কী আছে, তেমন কিছুতো হয়নি, হাতে সামান্য আঘাত পেয়েছি মাত্র! অর্থাৎ উছমান পা ও পেটের আঘাত টেরই পায়নি। তাতে কোন ব্যথাও অনুভব করেনি।

উছমানের সঙ্গীসাথীরা সবসময় তাকে একটি কথা বলতে শুনতো, শাহাদাত তো চাই, তবে জিহাদ করতে করতে বুড়ো হওয়ার পর।

শহীদ আব্দুর রহমান (আল-মিশরী)

একইভাবে শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়েছে আমাদের ভাই আব্দুর রহমান। সে ছিল বড় গুমনাম। নাম-ডাক তার একেবারেই পছন্দ ছিল না। দুনিয়ার জীবন যাপন করেছে নীরবে, জিহাদের ময়দানে এসেছে গোপনে। শাহাদাতও বরণ করেছে সংগোপনে। ঠিক যেন আল্লাহর রাসূলের সাহাবী হযরত আবু যর রা.-এর জীবনেরই ক্ষুদ্র নমুনা এবং হাদীসে বর্ণিত জান্নাতী যুবকের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সুসংবাদ ঐ বান্দার জন্য যে আল্লাহর রাস্তায়

জিহাদে সর্বদা ঘোড়া ছুটিয়ে চলে। তার মাথার চুল এলোমেলো হয়ে থাকে। পা দুটো থাকে ধূলোমলিন। খুব সাধারণ সিপাহী হিসাবে যুদ্ধ করে। তাকে পাহারায় নিযুক্ত করা হোক কিংবা পিছনের সারিতে দাঁড় করানো হোক, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। (আর সে এমনই সাদামাটা জীবন যাপন করে যে) অভিজাতদের কাছে সে উপেক্ষিত হয়। সে কোন সুপারিশ করলেও তা কবুল করা হয় না।

আরব যুবকদের সর্বাগ্রে সে রণক্ষেত্রে হাযির হয়েছিল এবং শায়েখ জালালুদ্দীনের সোহবতে খোস্ত প্রদেশের একটি ঘাঁটিতে নিযুক্ত করেছিল। শায়েখ জালালুদ্দীন ছিল তার আদর্শ। শত বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও মুহূর্তের জন্য সে ঘাঁটি ত্যাগ করতে সম্মত হয়নি।

সর্বক্ষণ ঘাঁটিতে অবস্থান করার কারণে তার সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ খুব কমই হত। অথচ তার চরিত্র-মাধুর্যের কারণে ইচ্ছে হত বারবার তার দর্শন লাভ করি। এজন্য দেখা হলেই আমি তাকে মৃদু তিরস্কার করতাম। কিন্তু স্বভাব-লাজুকতার কারণে কখনো সে কিছু বলত না।

আরেকজান্দ্রিয়ায় তার জন্ম এবং সেখানেই বেড়ে ওঠা, ছোট বয়স থেকেই তার প্রতিটি আচরণে-উচ্চারণে বীরত্ব ও সাহসিকতা ফুটে উঠত। বাচ্চারা যে বয়সে ডাঙ্গুলি ও মারবেল-গুলি খেলে ঐ বয়সে তার হাতে থাকত খেলনা পিস্তল-গুলি। আসল কথা হল, বড় হয়ে আকাশে ডানা মেলা পাখি, ডিম ফুটে বেরিয়েই ডানা ঝাপটায়।

যাহোক যুবক বয়সে যখন সে আফগানিস্তানের অবস্থা জানতে পারল, গজনবীর পুণ্যভূমি যখন ভয়ংকর বোমার বিকট শব্দে প্রকম্পিত হল তখন সে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল– আমিও শামিল হব মহান মুজাহিদীনের পুণ্য কাফেলায়। যারা সকল অসম্ভবকে সম্ভব করে এবং বুকের তাজা রক্ত দিয়ে নতুন মানচিত্র আঁকে। ইতিমধ্যেই সে পেশোয়ারের শায়েখ জালালুদ্দীন হক্কানী সম্পর্কে অবহিত হল এবং তার মহান ব্যক্তিত্বে প্রভাবিত হয়ে তার সান্নিধ্য গ্রহণ করল। আর শায়েখের আসন্ন মহা গুরুত্বপূর্ণ সফরে সঙ্গী হওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা ব্যক্ত করল। কারণ এটা সাধারণ কোন সফর না; বরং এ

সফর একটি জাতির ইতিহাস সৃষ্টি করে। পৃথিবীর মানচিত্রে গৌরব ও মর্যাদার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে। এ সফর একটি জাতির অস্তিত্ব দান করে এবং তার অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে।

পেশোয়ারের দোকান-পাট, রাস্তাঘাট, মনোমুগ্ধকর প্রকৃতি ও বিনোদনের মাঠ সবকিছু আব্দুর রহমানের কাছে অপরিচিত হয়ে উঠল। শায়েখ ও মুজাহিদদের ঘাঁটিই ছিল তার একমাত্র পরিচিত মহল। ঘাঁটির সঙ্গে তার এমন নিবিড় সম্পর্ক তৈরী হল যে, এক মুহূর্ত বাইরে থাকা তার জন্য অস্থিরতার কারণ হয়ে দাঁড়াত। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ওঠাবসা ও গল্পগুজব ছিল তার জন্য অসহনীয় যন্ত্রণা। কারণ এসব মজলিসে বেহুদা আলোচনা, রাজনৈতিক বিভিন্ন বিশ্লেষণ আর মুজাহিদদের সম্পর্কে মনগড়া বক্তব্য ছাড়া আর কিছুই হত না। দীর্ঘ পাঁচ বছর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অপারেশন পরিচালনায় সে ব্যস্ত থাকল। তাকে সাহায্য করত তিন সহযোদ্ধা আবু হাফস, মুস্তফা ও আবু উবায়দা। এরপর আবু হাফস মূল কেন্দ্রের পক্ষ থেকে ইসলামাবাদে ভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত হল। কিন্তু আব্দুর রহমান শায়েখের সোহবতেই রয়ে গেল।

কিছু দিন পর তার সহযোদ্ধারা আমাকে জানালো আব্দুর রহমানের বিবাহের প্রয়োজন। তাই পরিবার নিয়ে থাকার মত একটি ঘর প্রয়োজন। কথামত তার জন্য একটি ঘর এবং সংসার করার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আসবাব ব্যবস্থা করা হলো। আব্দুর রহমান বিবাহ করল। স্বাভাবিক নিয়মেই পরিবারকে সময় দিতে গিয়ে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা সময়ের পরিমাণ কমে গেল। তদুপরি ঘাঁটি ও বাড়ির মাঝে দূরত্বের কারণে আসা-যাওয়াতেই লম্বা একটা সময় অপচয় হতে লাগল। ফলে শায়েখের পরামর্শে ঘাঁটির পাশেই তার থাকার ব্যবস্থা করা হল।

আরব হওয়া সত্ত্বেও আব্দুর রহমান ফার্সী ভাষায় যথেষ্ট পারদর্শী ছিল। এজন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনী অন্যান্য আরবদের আটক করলেও তাকে কখনো ধরে রাখত না। তার সাবলীল ভাষার কারণে আফগান মনে করে তাকে ছেড়ে দিত।

অবশেষে শাহাদাত বরণ

"প্রত্যেক নফ্সই মৃত্যু বরণ করতে আল্লাহর হুকুমে সুনির্দিষ্ট সময়ে।"

আল্লাহর এই অমোঘ বিধানের কারণেই আব্দুর রহমান বার বার নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে পড়েও বেঁচে যাচ্ছিল। সর্বশেষ এক সড়ক দুর্ঘটনায় গাড়ীর সমস্ত যাত্রী মারা গেলেও আব্দুর রহমান অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। এভাবে একবার দু'বার নয়; অনেক বার নিশ্চিত মৃত্যু থেকে আল্লাহ তাকে বাঁচিয়েছেন, যাতে সে তার নির্ধারিত মেয়াদ পূর্ণ করতে পারে। অবশেষে মৃত্যু একদিন হাজির হলো শাহাদাতের সুসংবাদ নিয়ে। আশ্চর্যের বিষয় হলো যার শহীদী জানাযায় শরীক হওয়ার তামান্না ছিল অসংখ্য মুজাহিদের। আল্লাহর সেই প্রিয় বান্দা চলে গেল সবার অজান্তে। শেষ বিদায়টুকু জানানোর সুযোগ হলো না কারো।

তার রক্তমাখা দেহ পরম মমতায় আগলে নিল যমীন
জান্নাতী খুশবুতে সুরভিত হল আকাশ-বাতাস,
শুভ্র-উজ্জ্বল ললাট যদিও হল ধূলো ধূসরিত
কিন্তু ধূলোর পরশে যেন ঔজ্জ্বল্য হল আরো স্নিগ্ধিত।
ঠোঁটের কোণে ঝুলে আছে এক টুকরো মিষ্টি হাসি
এ যেন তুচ্ছ দুনিয়ার প্রতি তাচ্ছিল্য অবজ্ঞার হাসি,
নতুন দোলার ঘুমে বিভোর হয়ে স্বপ্নে দেখে
শীঘ্রই পৌঁছে যাবে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সবুজ দ্বীপে।

পবিত্র রমযানের মহান শহীদ মুজাহিদ ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী ও আহনাফ বিন কায়েস প্রমুখ মহান বীর পুরুষদের পুণ্যভূমি হেরাত থেকে ফিরে আসল তরুণ মুজাহিদ আবু সাইফ। হেরাতের বিশাল-বিস্তৃত মরু অঞ্চল ঘিরে যুগ যুগ ধরে চলে আসা যুদ্ধের ভয়ংকর বিবরণ শোনা গেল তার মুখে। আবু সাইফের মুখে একটি নাম বার বার শোনা যাচ্ছিল- মুওয়াহহিদ। নিজ শহর ছেড়ে সে আফগানিস্তানে হাযির হয়েছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের উদ্দেশ্যে। তার মহা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হল মুজাহিদদের পরস্পরের মাঝে মতানৈক্য-

ভেদাভেদ দূর করে জোর-মিল-মুহব্বত পয়দা করা। আবু সাইফের মুখে মুওয়াহহিদের নাম শোনার পর থেকেই তার সাক্ষাত লাভের জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে ছিলাম। প্রথম সাক্ষাতেই দেখলাম টগবগে এক যুবক, বীরত্ব ও প্রাণচাঞ্চল্য তার সমগ্র সত্তা থেকে ঠিকরে পড়ছিল। তার বিশুদ্ধ আরবী যে কারো দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। অথচ সে প্রতিষ্ঠানিকভাবে কোন পড়া শোনা করেনি।

সাহায্য কেন্দ্রে

তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল মুজাহিদদের সাহায্য কেন্দ্রে। আমি তাকে প্রস্তাব করেছিলাম, তুমি এখানে অবস্থান করে মুজাহিদদের খেদমতে নিজেকে ফানা করে দাও। অবাক হয়ে লক্ষ্য করলাম, অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে রাজি হয়ে গেল। অথচ তার যে যোগ্যতা ছিল তাতে অনায়াসেই সে লেখাপড়া অব্যাহত রেখে নিজেকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে যেতে পারত। দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকে রাত দিন ২৪ ঘন্টা তার সাহায্য-কেন্দ্রের চার দেয়ালের মধ্যেই কাটত। তবে ইলম ও আহলে ইলমের প্রতি আন্তরিকতার কারণে সে ওখানেও হাফেজ-মুহাদ্দিস ও ফকীহদের সোহবতেই সিংহভাগ সময় কাটাত।

তার এই অনুরাগ দেখে কিছু দিন পর শায়েখ আবুল হাসান মাদানী তার জন্য বিশেষ একটা প্রশিক্ষণকেন্দ্র খুলে দিলেন। সেখানে অল্পসংখ্যক মুসলিমদের উপর সবিশেষ মেহনত করা হবে, যাতে তারা লেখাপড়ার পাশাপাশি আল্লাহর রাস্তার একনিষ্ঠ মুজাহিদ ও জীবন উৎসর্গকারী সৈনিক হিসাবে গড়ে উঠতে পারে।

ঐতিহাসিক সমঝোতা

মুজাহিদদের বিশেষ একটি কেন্দ্র ছিল, যেখান থেকে সাতজন সিপাহসালারকে নিয়ন্ত্রণ করা হত। এদের প্রত্যেকের অধীনে ছিল অসংখ্য

ক্ষুদ্র বাহিনী। যারা ছোট ছোট ইউনিটে বিভক্ত ছিল। স্বাভাবিক কারণেই এদের পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করা শত্রুবাহিনীর পক্ষে খুবই সহজ ছিল, এবং প্রায়শই তাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হত। তখন আফগান যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জনাব হেকমতিয়ার সাহেবের খেদমতে ছিল একজন তরুণ যোদ্ধা। ইতিহাস তাকে সংরক্ষণ করে রেখেছে এই কারণে যে, এই অল্প বয়সেই সে মুজাহিদদের বিশাল জামাতের মধ্যে মতানৈক্য ও ভেদাভেদ দূর করে সবাইকে একসূত্রে গেঁথে রাখতে সক্ষম হয়েছে। মুসলমানরা যখন প্রত্যেকেই নিজ নিজ প্লাটফর্ম থেকে নিজের মত করে অভিযান চালানোর জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, নিজেদের বীরত্ব ও সাহসিকতা প্রদর্শনের চূড়ান্ত রূপরেখা তৈরি করছিল তখন এই তরুণ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করল যে, এটা শত্রুদের তৈরি করা ফাঁদ, এখানে পা দিলে আমরা সবাই ফেঁসে যাব। আমাদের বরং উচিত হবে, ঐক্যবদ্ধ হয়ে কিছু করা। তার এই সতর্কবাণী মুজাহিদ বাহিনীকে বিরাট বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছে। এ হল সেই তরুণ ইতিহাস যাকে মুওয়াহহিদ নামে স্মরণীয় করে রেখেছে।

নতুন অভিযানের প্রস্তুতি

শায়েখের নির্দেশে মুওয়াহহিদ এবার নতুন অভিযানের জন্য নতুন এক কাফেলা প্রস্তুত করতে লাগল। শায়েখ তাকে ইচ্ছাকৃতভাবেই কোন প্রকার সাহায্য করা থেকে বিরত থাকলেন। যাতে এই অভিযানের পূর্ণ কৃতিত্ব শিষ্য একাই লাভ করতে পারে। কাফেলা রওয়ানা হওয়ার আগ মুহূর্তে মুওয়াহহিদ বলল, আল্লাহ যদি আমাকে শাহাদাত নছীব করেন এবং একজনের বিষয়ে সুপারিশ করার অনুমতি দেন তাহলে আমি শায়খে মুহতারাম আবুল হাসান মাদানীর জন্যই সুপারিশ করব। দুইশ উটের বহর নিয়ে কাফেলা রওয়ানা হলো। কিন্তু আফসোস, মুনাফিকদের মাধ্যমে শত্রুপক্ষ খবর পেয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বিমান থেকে গোলা ছোঁড়া শুরু হল। মুজাহিদরা যদিও আল্লাহর রহমতে বিশেষভাবে বেঁচে গেল, কিন্তু উটগুলো সমস্ত সামানসহ পুড়ে ছাইভস্ম হয়ে গেল। মুওয়াহহিদ তার সঙ্গীসাথীদের নিয়ে কাঙ্ক্ষিত ঘাঁটিতে পৌছে গেল এবং সেখানকার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে

জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর নানামুখী তৎপরতা শুরু করল। পাশাপাশি তালীম-তারবিয়াতের মারকায হিসাবে মাদরাসা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করল। এভাবে ধীরে ধীরে সে সকলের আশা ও প্রত্যাশার প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হল। তাকে ঘিরেই সবাই স্বপ্ন দেখে, তাকে কেন্দ্র করেই সবাই প্রত্যাশার জাল বুনে। আর আল্লাহর খাছ মেহেরবাণীতে তার অল্প সময়ের মেহনতে মুজাহিদদের ঐক্যের ভিত যথেষ্ট মজবুত হল। চাটুকার চোগলখোরদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ল। আল্লাহর কাছে সবসময় সে দুআ করত– আমাকে দীর্ঘ হায়াত দান করো যাতে মুসলমানদের ভূমিকে মুনাফিক মুক্ত করতে পারি। ইহুদী-খৃষ্টানদের ক্রীড়ানক, তাবেদার পুতুল সরকার ও তার অনুগত বাহিনী থেকে ইসলামের ভূমি পাক-পবিত্র করতে পারি। ইতিমধ্যে আল্লাহ তাকে মিলিয়ে দিলেন জারুদ-এর মত একনিষ্ঠ বন্ধু, চিন্তা-চেতনায় যে ছিল মুওয়াহহিদেরই কার্বনকপি। জারুদের ও চব্বিশ ঘন্টার ফিকির ছিল মুজাহিদদের ঐক্য সুদৃঢ় করা। দূরত্ব ও মতানৈক্য যে কোন মূল্যে বিদূরিত করা। কারণ বিদ্বেষ-ভেদাভেদ শক্তি ও মনোবল এমনভাবে নির্মূল করে ক্ষুর যেমন পশমকে নির্মল করে। জারুদ ও মুওয়াহহিদ দুই বন্ধু ঐক্য-প্রচেষ্টার শক্তিশালী সুদৃঢ় দুইটি স্তম্ভ, যার উপর দাঁড়িয়েছিল আফগান জিহাদের সুবিশাল প্রাসাদ। সুতরাং হাজারো নফল ইবাদতের চেয়ে বহুগুণ শ্রেষ্ঠ ছিল তাদের এই আমল।

যুগপৎ বিজয় ও শাহাদাত

যুদ্ধ জয়ের জন্য প্রথম শর্তই হল শত্রুক্যাম্প জয় করা এবং শত্রুবাহিনীকে কোণঠাসা করে পিছে হটতে বাধ্য করা। মুওয়াহহিদও একই পন্থা অবলম্বন করল। একে একে তিনটা শত্রু ক্যাম্প গুঁড়িয়ে দিল। অবশেষে যখন বিজয় নিশ্চিত হল হঠাৎ একটা গোলা এসে আঘাত হানল। সঙ্গে সঙ্গে মুওয়াহহিদ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে। শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে রওয়ানা হল জান্নাতের উদ্দেশ্যে।

তার মৃত্যু-সংবাদ সমগ্র মুজাহিদদের জন্য বজ্রের মত আপতিত হল। সিপাহসালার হেকমতিয়ার বললেন, মুওয়াহহিদের পরিবর্তে যদি আমার দশজন সন্তানকে চাওয়া হত তবুও আমি খুশি মনে দিয়ে দিতাম।

একদিকে ছিল বিজয়ের আনন্দ, অন্যদিকে ছিল তার মৃত্যুর শোক। ঠিক যেমন বিবাহের বাড়িতে মৃত্যুর শোক।

তার ইবাদতগুযারী

হযরত আনাস রা. বলেছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় হযরত তালহা রা.-কে সচরাচর নফল রোযা রাখতে দেখা যেত না। অথচ নবীজীর ইন্তেকালের পর আর কখনো আবু তালহার ঘরে চুলা জ্বলতে দেখা যায় নি। তবে যুদ্ধের সময় শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে দিনে আহার করতেন।

আবুল হাসান মাদানীও তার শিষ্য মুওয়াহহিদ সম্পর্কে বলেছেন– মাঝেমধ্যেই সে পেশোয়ারে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। কখনোই তাকে রোযাহীন অবস্থায় আমি পাইনি। একদিন আমার বাড়িতে সে রাত যাপন করল। আমি লক্ষ্য করলাম মাঝ রাতে সে উঠে গেল এবং দীর্ঘ নামাযে মশগুল হল। তার তেলাওযাত এত শ্রুতিমধুর ছিল যে, মনে হচ্ছিল কোরআনের এই আয়াতগুলো মাত্র নাযিল হচ্ছে। মাত্র ১৩ বছর বয়সে মাতৃভূমি থেকে হিজরত করে আফগানিস্তানের জিহাদে শরীক হয়েছিল। সুখের জীবন ত্যাগ করে ক্ষুধা ও কষ্টের এবং রক্ত ও মৃত্যুর পথ বেছে নিয়েছিল। খুব অল্প বয়সেই সিপাহসালারের ঝাণ্ডা হাতে তুলে নিয়েছিল।

শাহাদাতের আগে যে অভিযানে সে বিজয় অর্জন করেছিল, তার উপলক্ষ ছিল চমৎকার। শত্রু বাহিনী আফগানিস্তানে হামলার দশম বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একটা সেমিনারের আয়োজন করেছিল। মুওয়াহহিদ প্রতিজ্ঞা করল, তাদের এ উদ্দেশ্য কোনভাবেই সফল হতে দেব না। তাদের আনন্দ শোকে রূপান্তরিত করব। তাদের আলোকসজ্জাকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গে পরিণত করব। ব্যস যেমন ভাবনা তেমন কর্ম। মুজাহিদদেরকে নিয়ে পুরো এলাকা ঘেরাও করে চারপাশ থেকে একযোগে হামলা চালাল। মুহূর্তেই তাদের সবকিছু তছনছ হয়ে গেল। মুসলমানদের বিজয় নিশ্চিত হল। এমন সময় হঠাৎ একটা গোলা এসে আঘাত করল। আল্লাহর প্রিয় বান্দা মুওয়াহহিদ

রমযানের পবিত্র মাসে শাহাদাতবরণ করল। তবে আক্ষেপ একটাই যে সে তো চলে গেল আল্লাহর দরবারে, কিন্তু নিষ্ঠুর দুনিয়ার নির্মম কষাঘাতে জর্জরিত করে রেখে গেল তার অসহায় স্ত্রী ও এতীম এক ছেলে, এক মেয়েকে। আয় আল্লাহ! তুমি তাদের সর্বোত্তম উকিল হয়ে যাও।

গ্রীষ্মের শহীদান

শীতের ঠাণ্ডা দিনগুলো অতিক্রান্ত হয়ে শুরু হল প্রচণ্ড গরম। প্রাকৃতিক গরমের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রচণ্ড রুদ্ধ রৌদ্রমূর্তি ধারণ করল, যুদ্ধের ময়দানও মুজাহিদদের জন্য সময়টা ছিল বিভীষিকার মত। একের পর যোদ্ধারা শহীদ হয়ে যাচ্ছে, অথচ বিজয়ের তেমন কোন সুখবরও আসছে না। তো এখন আমরা আলোচনা করব এমন কয়েকজন শহীদের জীবনী, যারা এই গ্রীষ্মে শাহাদাত বরণ করেছিল। আশা করা যায় তাদের প্রাণোচ্ছল জীবন চরিত আমাদের নিষ্প্রাণ আত্মায় নবজীবনের সঞ্চার ঘটাবে।

শহীদ আবুল ওয়ালীদ

একদিন সকালে আব্দুর রহমান মিছরী'র ঘাঁটির দিকে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ দেখলাম দুজন সহোদর ঘাঁটি থেকে ফিরে আসছে। একজন আমাকে কানে কানে বলল, আবুল ওয়ালীদ শহীদ হয়ে গেছে। এই সংবাদ শোনার পর ঘাঁটির দিকে আমার জন্য ভীষণ কষ্টদায়ক হয়ে গেল। ঘাঁটিতে পৌঁছে আবুল ওয়ালীদের বিষয়ে জানতে চাইলাম। সহযোদ্ধাদের মুখে তার হালত শুনে আমার খায়রুল করুনের কথা মনে পড়ে গেল।

আবুল ওয়ালীদ ঘাঁটি পাহারার দায়িত্ব পালন করত রাত বারটা থেকে একটা পর্যন্ত। তারপর বাকী রাত নামাযের মধ্যেই কাটিয়ে দিত; বিছানায় পিঠ দিত না।

সেদিনও পাহারা শেষে ফজর পর্যন্ত নফল নামায পড়ল। সুবহে সাদিক হওয়ার পর সে নিজেই ফজরের আযান দিল। নামায শেষ করে দীর্ঘ সময়

অযীফা আদায় করল। তারপর আমাদের সঙ্গে নিজ গন্তব্যে রওনা হল। সারা রাস্তা দুরুদ ও কোরআন পড়ছিল। রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে সে সূরা কাহাফ সমাপ্ত করেছিল। দিন শেষে যখন সে আজকের মত অভিযান সমাপ্ত করতে যাচ্ছিল, ঠিক এমন সময় একটা গোলা এসে তাকে আঘাত করল এবং ওখানেই সে শাহাদাত বরণ করল। আবুল ওয়ালীদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা রস্‌স নামক অঞ্চলে। নিজ গ্রামে প্রাথমিক লেখাপড়া শেষ করার পর রিয়াদে জামেয়াতুল মালিক সউদ বিশ্ব বিদ্যালয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেছে। কিন্তু একসময় রড-বালু আর ইট-সিমেন্টের নিরস বিদ্যা তার কাছে অসহনীয় হয়ে উঠল। তাই সে এসব ফেলে তরবারী আর ঘোড়ার সন্ধানে ছুটল। সুখ-সচ্ছলতার জীবন ত্যাগ করে রক্ত-যন্ত্রণার জীবন গ্রহণ করল। এক্ষেত্রে অবশ্য তার মায়ের অবদান অনেক বেশী। কারণ তিনিই তাকে সব সময় উৎসাহ দিতেন, এবং জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন। আবুল ওয়ালীদের রোযা ছিল পরিচিত মহলে আলোচনার বিষয়। কারণ সে সোম-বৃহস্পতি ও আইয়ামে বীয-এর রোযাসহ কোন নফল রোযা তরক করত না। আল্লাহ তাকে জান্নাতে উচ্চ মাকাম নছীব করুন। আমীন।

শহীদ মাযিন

জিদ্দার টগবগে যুবক মাযিন। জাতিগতভাবে আরব হলেও তার মাথায় শোভা পায় বিশাল আফগানী পাগড়ি। ঘরে বাইরে, ঠাণ্ডায়-গরমে কখনো সে পাগড়ি ছাড়া থাকে না। রমযানে সে হারাম শরীফে থাকে। বাইতুল্লার ইমাম সুদাইসী এবং মসজিদে নববীতে হুযাইফী'র হৃদয় নিংড়ানো তেলাওয়াত তাকে সীমাহীন মুগ্ধ করে। কিন্তু জিহাদের ময়দানে তীর-তরবারীর ঝনঝনানী, ট্যাংক-কামানের গোঙ্গানী'র যে আওয়াজ তার মধুরতার কোন তুলনাই হয় না। যদিও মাযিন হারামে বসেও জিহাদ ও মুজাহিদদের খবরাখবর রাখে, কিন্তু লোকমুখে শোনা বাহিনী তার সশরীরে ময়দানে উপস্থিতি তো কখনো এক হতে পারে না। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের যত রাস্তা আছে কোনটাই সে বাদ দেয় না। সৎ কাজের আদেশ অসৎ কাজে বাধা সব উপায়ে সে পালন করে। তা সত্ত্বেও সূরা তাওবা তার ঘুম হারাম

করে রাখে। জিহাদের আয়াতগুলো তাকে নারী-শিশুদের কাতার থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য করে।

মাযিনের অবস্থা ছিল ঠিক হযরত মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ রা.-এর মত। জনৈক তাবেঈ দেখলে তিনি একটা চেয়ারে বসে আছেন। শীর্ণতার কারণে তিনি যেন টেবিলের মধ্যে হারিয়ে গেছেন। তাবেঈর জিজ্ঞাসা- জিহাদ করতে করতে আপনার আজ এই অবস্থা হয়েছে। এ বছরটা বিরতি দেয়া যায় না! যাতে শরীর কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ার সুযোগ পায়। সাহাবী উত্তর দিলেন– সূরা তাওবা তো সে সুযোগ রাখেনি।

জিহাদের ময়দানে

মাযিন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বিদায়ের কথা জানিয়ে দিল। এতে অন্যান্যদের মধ্যেও বিদায়ের হিড়িক পড়ে গেল। এদিকে মাযিনের সনদ লাভের সময়ও ঘনিয়ে এসেছিল। তাই কর্তৃপক্ষ ভীষণ পেরেশান হল এবং সর্বউপায়ে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করল। কিন্তু কোন কিছুতেই কাজ হল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যস্ত জীবন থেকে ছুটি পেয়ে প্রথমে সে মক্কার বিনোদন অঞ্চলে চলে গেল। অনেক আগে থেকেই সেখানে তার যাওয়া-আসা ছিল। ফলে ছোট-বড় সবার কাছেই সে পরিচিত ছিল। তদুপরি ছোট-বড় যে কোন অন্যান্য সর্বশক্তি দিয়ে রোধ করার কারণেও সর্বমহলে সে আলোচিত ছিল। আর প্রতি বছর হারামে ইতেকাফ করার কারণে আহলে হারামের কাছেও সে সমাদৃত ছিল।

মাযিন ছিল অত্যন্ত নীরব স্বভাবের। মুখে তেমন কথা বলত না, তবে তার ভিতরটা সর্বক্ষণ ফুটন্ত ডেগের মত টগবগ করত, এই আক্ষেপে যে, দ্বীন ইসলামকে সকল কুফুরী শক্তি নিজেদের টার্গেটে পরিণত করেছে। যে যেদিক পারছে আক্রমণ করছে। এমনকি মুসলমানদেরও একটা স্বার্থান্বেষী শ্রেণী নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার কাজে দ্বীনকে ব্যবহার করছে।

এ কারণে মাযিন-এর কাছে কোরআন তেলাওয়াতের সুমধুর আওয়াজের চেয়ে ট্যাংক-কামানের গগন বিদারী আওয়াজ অনেক বেশী প্রিয় লাগে। ফলে সারা বিশ্বে তার দৃষ্টিতে শুধু আফগান জাতিকেই অভিজাত ও মর্যাদাশীল জাতি মনে হত। কারণ একমাত্র আফগানরাই বাতিল পরাশক্তির সামনে মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে বীরদর্পে দাঁড়িয়ে আছে।

মক্কার বিনোদন-অঞ্চল থেকে এক কাফেলার সঙ্গে সরাসরি আফগানিস্তানে চলে গেল। যাওয়ার সময় পর্যাপ্ত অর্থসম্পদ সঙ্গে নিয়ে নিল। রণাঙ্গনে পৌঁছে বেশ কিছু নিতে থাকল। এক ঘাঁটি থেকে আরেক ঘাঁটিতে গিয়ে মুজাহিদদের কার কী জরুরত সেগুলো পুরা করছিল। বাজারে গিয়ে নিজের হাতে সামান খরিদ করে সবার কাছে পৌঁছে দিল। এভাবে খুবই অল্প সময়ে মাযিন সবার প্রিয় পাত্র হয়ে গেল। সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে নিষেধের পাশাপাশি সারা দিন রোযা রাখা, সারা রাত ইবাদত করা তার মহৎ চরিত্রের অন্যতম দিক ছিল।

আমার বিশ্বাস তার তাকওয়া-তাহারাতের বরকতে আল্লাহ সবকিছু তার জন্য সহজ করে দিয়েছিলেন। কারণ আল্লাহর ওয়াদা আছে– ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا যে আল্লাহকে ভয় করবে আল্লাহ তার জন্য উপায় বের করে দেবেন এবং তার জন্য সকল বিষয় সহজ করে দেবেন। গুণীজনেরা বলেন– হৃদয়ের গভীর থেকে বের কথা হৃদয়কেই স্পর্শ করে, আর মুখের হাওয়াই কথা বাতাসে মিলিয়ে যায়, কাউকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

মাযিন যেহেতু আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিবেদিত প্রাণ ছিল, জিহাদ ও মুজাহিদদের প্রতি আত্মনিবেদিত ছিল তাই স্বাভাবিকভাবেই তার কথাগুলো অন্যদের হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করত। কিন্তু নিয়তির লিখনই হল– ভাল মানুষগুলো তাড়াতাড়ি চলে যায়। মাযিনও এর ব্যতিক্রম ছিল না। পুরোনদের আগেই সে চলে গেল। একদিন সে কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে একটি মসজিদে অবস্থান করছিল, মুজাহিদদের কয়েকটি ক্ষুদ্র দলের মাঝে মতানৈক্য দূর করার উদ্দেশ্যে। কিন্তু শত্রুরা তাদের অবস্থান টের পেয়ে

মসজিদের মধ্যেই সবাইকে শহীদ করে ফেলে। এভাবে সমঝোতার মহান খেদমত আঞ্জাম দিতে গিয়ে নিজের জীবন বিলিয়ে দেন আল্লাহর এই প্রিয় বান্দা।

শহীদ মাযিন-এর কলমের আর্তনাদ

আমার কলমের এ আহ্বান, আমার আত্মার এ আর্তনাদ তোমার জন্য হে প্রিয় ভাই, শুধু তোমার জন্য। হও তুমি হাজি, কিংবা হও মুসল্লী, অথবা ধারণ করো জুব্বা-দাড়ি, আমার এ আহ্বান তোমারই প্রতি; জিহাদের আহ্বান। তুমি তো হে ভাই! নিশ্চয় জানো, জিহাদ তোমার প্রতি তেমনই ফরয, নামায ও রোযা যেমন ফরয। আমি আরো সুস্পষ্ট করে বলি, জিহাদ প্রত্যেকের উপরই ফরযে আইন, নামায-রোযার ক্ষেত্রে যেমন কোন অজুহাত চলে না, জিহাদের ক্ষেত্রেও কোন অজুহাত চলবে না।

কেন জানি আমরা ধরেই নিয়েছি ইসলাম হচ্ছে নামায-রোযা আর হজ্জ-যাকাত, জিহাদের সেখানে কোন ভূমিকা নেই। তাহলে কোরআনের অসংখ্য আয়াতে কেন জিহাদের গুরুত্ব ও মুজাহিদদের জন্য বিশাল বিশাল পুরস্কারের কথা বলা হলো! জান্নাতুন নাঈমের কল্পনাতীত নাযনেয়ামত এবং জান্নাতুল ফেরদাউসে নবীদের সোহবত-এর মত পরম সৌভাগ্য মুজাহিদদের জন্য কেন? আর নবীজীই বা কেন বললেন, الجهاد ماض إلى يوم القيامة। জিহাদ কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

والذى نفسى بيده لوددت أنى اقتل فى سبيل الله ثم أحيا ثم اقتل ثم احيا

ঐ যাতের কসম যার হাতে আমার প্রাণ, আমার তামান্না আমি আল্লাহর রাস্তায় কিতাল করতে করতে শহীদ হয়ে যাই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই। পুনরায় আমাকে জীবিত করা হোক, আমি আবার শহীদ হয়ে যাই। অথচ আল্লাহ তার নবীর সামনের পিছনের সমস্ত গোনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

দ্বীনের মধ্যে জিহাদের যদি কোন ভূমিকাই না থাকবে তাহলে নবীজী এসব কথা কেন বলেছেন?! সুতরাং হে আমার প্রিয় ভাই, এখনো যেহেতু তোমার জীবন-প্রদীপ প্রজ্বলিত আছে, সুতরাং এখনই তুমি এই ফরয আমল আঞ্জাম দেয়ার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করো।

আসলে আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি তোমার উপস্থিতিকে অপরিহার্য করে তুলেছে। সুতরাং ভীতি ও অলসতা ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়ো আল্লাহর পথে। ইসলামের সঠিক বার্তা অনুধাবন করে আল্লাহর সৈন্যবাহিনীতে যোগদান করো।

আরেকটা কথা বলে রাখা ভালো মনে করছি। আফগানিস্তানে গেলেই যে তোমাকে সরাসরি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে, বিষয়টা এমন নয়, সেখানে বরং তোমার জন্য অনেক কাজ অপেক্ষা করছে। মুজাহিদদের সন্তানদের লেখা পড়া শেখানোর মত কেউ নেই। অনেক সময় বাধ্য হয়ে তাদের শিক্ষা দীক্ষার দায়িত্ব অমুসলিমদের হাতে অর্পণ করতে হয়। এক্ষেত্রে তুমি অনেক বড় ভূমিকা রাখতে পারো। সুতরাং গা ঝাড়া দিয়ে ওঠো এবং আফগানিস্তানের মাটিতে তোমার সাধ্যমত ভূমিকা পালনে ব্রতী হও। আর মনে রেখো, আফগানিস্তানের সীমান্ত এখনো তোমার জন্য উন্মুক্ত। যে কোন সময় তা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। তখন শত আক্ষেপ করেও কোন লাভ হবে না। সুতরাং সময় থাকতে একবার অন্তত নিজের ঈমানের পরীক্ষা নাও। নিজের উপর অর্পিত দায়িত্ব আঞ্জাম দাও।

পরিশেষে তোমার কাছে আমার একটাই আবেদন, বিষয়টি তুমি গভীরভাবে চিন্তা করবে। আর স্মরণ রাখবে– জান্নাতকে বিভিন্ন কষ্ট ও অপ্রিয় বিষয় দ্বারা পরিবেষ্টিত করে রাখা হয়েছে। আর জাহান্নামকে সুখ-শান্তি ও প্রাণপ্রিয় জিনিস দ্বারা ঘিরে রাখা হয়েছে।

সুতরাং আমি তোমার জন্য দুআ করি, আল্লাহ যেন তোমাকে তার কালিমা বুলন্দ করার মেহনতে কবুল করেন এবং আল্লাহর বাহিনীতে সংযুক্ত করেন। যাতে তুমি নবীগণ, সিদ্দীকীন, শহীদান-সালেহীনদের সঙ্গে হাশর করেন। বন্ধু হিসাবে তারা কত উত্তম!

কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালবাসে। ৬০

আমার প্রাণপ্রিয় বন্ধু! এত কথা তোমাকে শুধু এজন্য বললাম যে, আমি তোমাকে মুহাব্বত করি শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে। –মা'আস সালাম।

বিরওয়ানার সিংহপুরুষ শহীদ মুওয়াহহিদ

আজ ছাইফ হিরাত থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন, তিনি আমাদেরকে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং মুজাহিদদের বীরত্বের কাহিনী শুনালেন। তাদের অন্যতম ছিলেন শহীদ মুওয়াহিদ। তিনি বলেন, মুওয়াহিদ বীরওয়ান থেকে আফগানে আগমন করলেন মুজাহিদদেরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং একতাবদ্ধ করার মহান উদ্দেশ্যে। তখনো পর্যন্ত আমি তার সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করিনি। অস্থির প্রতীক্ষায় ছিলাম তাকে দেখার জন্য। অবশেষে একদিন তাকে দেখার নছীব হলো, সুবহানাল্লাহ কী অপূর্ব সুন্দর যুবক। চেহারায় পূর্ণ উদ্যম ও উদ্দীপনার ছায়া, ঈমানী গায়রত, জিহাদি চেতনায় প্রাণবন্ত। হৃদয়গ্রাহী বিশুদ্ধ আরবী তার ভাষা। অথচ তিনি না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, না কোন জামেআ ইসলামিয়ার ছাত্র। উঁচু মনোবল ও হিম্মতের অধিকারী এই যুবকের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাত হয় আনছারদের প্রশিক্ষণাগারে। আমি তখন তার সামনে প্রস্তাব রাখলাম, তিনি যেন এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। যাতে তার প্রচেষ্টায় ছাত্রদের মাঝে দলীয় মনোভাব থাকলে দূর হয়ে যায় এবং সবার অন্তরে জিহাদী চেতনা সর্বদা জাগরুক থাকে এবং তারা যেন তাদের কোরআন, হাদীস, ফিকাহ, তাফসীরের আসাতেযায়ে কেরামের সোহবত থেকে শরয়ী ইলমের পাশাপাশি এ শিক্ষাটিও পায়। কিন্তু তিনি সবিনয়ে আমার কাছে অবকাশ চাইলেন। এতে আবুল হাসান মাদানী সাহেবের হাত থেকে তিনি ছুটতে পারলেন না। তিনি তার জন্য খাস একটি প্রতিষ্ঠান খুলে তার তত্ত্বাবধানে অর্পণ করলেন। সেখান থেকে তিনি মুজাহিদদের একটি মেছালী জামাত গড়ে তুলবেন যারা প্রতিবন্ধক সর্বপ্রকার মুহাব্বত ও সম্পর্ক থেকে মুক্ত থাকবে।

জারসুফা নামক স্থানে মুজাহিদদের মহা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাতজন বিশিষ্ট সেনাপতি। তারা লাখো জনতার সামনে জিহাদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরলেন এবং মুজাহিদদের থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন যে, তারা আন্তর্জাতিক সকল ষড়যন্ত্রের মোকাবিলা করে জিহাদ চালিয়ে যাবে। ইতিমধ্যে অল্প বয়সের সেই মুওয়াহহিদ দাঁড়িয়ে ঐক্যের শ্লোগান দিলেন এবং প্রবল জোশের সাথে অগ্নিঝরা বক্তৃতা দিলেন। ফলে, মুজাহিদ শিবিরে ব্যাপক সাড়া জাগলো। যেন তিনিই এ সম্মেলনের প্রধান আকর্ষণ।

মুওয়াহহিদ আবুল হাসানের কাছে অনুমতি চাইলেন, অনুমতি পেয়ে তিনি বীরওয়ানের উদ্দেশ্যে একটি কাফেলা প্রস্তুত করলেন। সবাইকে সাক্ষী রেখে তিনি উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ইনশাআল্লাহ অবশ্যই আমি শহীদ হবো এবং অন্য শহীদানের মত শাফায়াতের মাকাম লাভ করবো। তখন আমি আল্লাহর দরবারে বলবো, সর্বপ্রথম আমি আবুল হাসান মাকামীর জন্য সুপারিশ করতে চাই।

মুওয়াহহিদের নেতৃত্বে কাফেলা সামনে অগ্রসর হলো, খাবার-পানি এবং অস্ত্রে-সস্ত্রে সুসজ্জিত যুদ্ধযানের কাফেলা। মুনাফিকদের মাধ্যমে খবর পৌঁছে গেলো কাবুল কমিউনিস্টদের ঘাঁটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ঝাঁকবেধে যুদ্ধ বিমান এসে একযোগে হামলা শুরু করলো, ফলে কাফেলা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো। সামানপত্র পুড়ে যেতে লাগলো, এবং সংরক্ষিত বোমাগুলো বিস্ফোরিত হতে লাগলো। মুওয়াহহিদ ঘাবড়ালেন না। অগ্নিবৃষ্টি মাথায় করে ছুটে চললেন লক্ষ্যপানে, অবশেষে আল্লাহর অশেষ রহমতে বীরওয়ালায় ঘাঁটিতে পৌছলেন।

এবার শুরু হল তার জিহাদী তৎপরতা। ঐ অঞ্চলের দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। প্রয়োজনীয় শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসূচি শুরু করলেন। তিনি ছিলেন সবার ভরসা ও আস্থার কেন্দ্রবিন্দু। বহুমুখী যোগ্যতার অধিকারী। তার প্রতি মানুষ শুধু আকৃষ্ট হয়, দূরে সরে যায় না।

তিনি বাহির রাষ্ট্রের গোয়েন্দা ও গুপ্তচর থেকে মুক্ত থাকার বিষয়ে সর্বোচ্চ মনোযোগী হলেন।

যারা মুজাহিদদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে এবং কিছুটা সফলতাও লাভ করেছে তারা সব সময় জারুদের পিছে লেগে থাকে, কারণ ঐক্য সৃষ্টির জন্য এ কাফেলাটিই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মুওয়াহহিদ এবং জারুদ দুজনই ইস্পাতের মত দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের তৎপরতা চালাতে থাকলেন। যা মূলত নফল নামাজ রোজার চেয়ে অনেক উত্তম। হাঁ, পরস্পরের মাঝে জোড়মিল সৃষ্টি নফল ইবাদতের চেয়েও উত্তম। কারণ পরস্পরের মাঝে বিভেদ এবং দুঃসম্পর্ক দ্বীনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়।

এই পদক্ষেপ সমাপ্ত করে মুওয়াহহিদ পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলো জয় করার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। হামলা তৎপরতা শুরু হল। অনেক দক্ষতার সঙ্গে নেতৃত্ব দিলেন। কমিউনিস্টদের তিনটি ঘাঁটি জয় করলেন।

একদিন যুদ্ধ করতে করতে হঠাৎ একটি গোলা এসে তাকে আক্রান্ত করে এবং তিনি শাহাদাত বরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

চারদিকে তার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়লো। মুজাহিদ শিবিরে যেন বাজ পড়লো। অন্যরাও গভীরভাবে শোকাহত হলো। ইঞ্জিনিয়ার মো. হিকমতইয়ার প্রচণ্ড আঘাত পেলেন। তিনি বললেন, জীবিতদের মাঝে মুওয়াহহিদের মত কাউকে ভালোবাসা যায় না। হায় আমার সন্তান-সন্ততি সবার বিনিময়ে যদি মুওয়াহহিদকে ফিরে পেতাম।

মুওয়াহহিদ রোজা রাখতেন আর রাতে ইবাদত করতেন। আবুল হাসান মাদানী বলেন, মুওয়াহহিদ পেশওয়ারে আমার কাছে আসতো, এবং রাতেও অবস্থান করতো। দিনে কখনো আমার বাসায় কিছু খায়নি। রাতে দেখেছি দীর্ঘ নামাজ পড়তে এবং ফজরে আমাদেরকে নিয়ে জামাত করতে। তেলাওয়াত শুনে মনে হত, অর্থ বুঝে দেখে দেখে তেলাওয়াত করছে।

একত্রিশ বছর বয়সে তিনি জিহাদের উদ্দেশ্যে হিজরত করেছেন। তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছিলেন। অবশেষে উনিশে রামাযানে তিনি শাহাদাত বরণ করলেন। সন্তান-সন্ততি ইয়াতিম হলো। স্ত্রী বিধবা হলো। হে আল্লাহ তুমি তাদের জন্য কাফীল হয়ে যাও। তাদের অভাব দূর করে দাও। তাদের সকল প্রয়োজন পূর্ণ করে দাও।

শহীদ খালীদ আলা আল কিবলান

(উরফে আবুল ওয়ালিদ)

শীত বিদায় নিলো। গ্রীষ্মের আবহাওয়া শুরু হলো। যুদ্ধ ক্রমেই তীব্র হতে লাগলো। একের পর এক মুজাহিদীন শাহাদাত বরণ করছেন। শহীদানের রক্ত মুজাহিদদের উদ্যম উদ্দীপনা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে।

এক সকালে আমি আব্দুর রহমান মিশরীর ঘাঁটিতে যাচ্ছিলাম, পথে দুই মুজাহিদ ভাইয়ের সাথে দেখা হলো, তারা ঘাঁটি থেকে ফিরছিলেন, ভাই আবু সাঈদ আমাকে রাস্তায় একপাশে নিয়ে কানে কানে বললেন, গতকাল জুমুআর পর আড়াইটার সময় আবুল ওয়ালীদ শাহাদাত বরণ করেছেন। বললাম তার শাহাদাত শুভ হোক, এই সংবাদ শুনে চা পর্বে উপস্থিত হলাম ঘাঁটিতে। একদল তরুণ আমাকে স্বাগত জানালো। অস্থির হয়ে আবুল ওয়ালিদের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, তারা বলতে লাগলো, তার জীবনের কথা এবং বিভিন্ন ঘটনা, আমার মনে হচ্ছিলো সত্যি আবুল ওয়ালিদ খায়রুল কুরুনের জীবন্ত নমুনা ছিলেন।

তারা বললো আবুল ওয়ালীদ পাহারার জন্য রাত বারোটা থেকে একটা পর্যন্ত সময় বেঁছে নিতেন। যাতে এরপর ফজর পর্যন্ত কিয়ামুল লাইলে মশগুল থাকতে পারেন, ভীষণ অসুস্থতা ছাড়া তিনি কখনো পাহারার দায়িত্ব ছাড়তেন না।

একইভাবে গত জুমুআর রাতে নির্ধারিত পাহারাদারিতে ফজর পর্যন্ত নামাজ পড়লেন। তার পবিত্র অভ্যাস ছিলো তিনি আজান দেয়ার জন্য প্রতিযোগিতা করতেন। আজ ফজরে তিনি আজান দিলেন। ফজরের নামাজের পর দীর্ঘ আযকার পাঠ করলেন। এরপর ক্ষেপণাস্ত্র নিয়ে আমরা তিনজন (আবু সাঈদ, আবু দোজানা, এবং আবুল ওয়ালিদ) চললাম কমিউনিস্টদের ঘাঁটির দিকে। সারাপথ তার ঠোঁটদুটি নড়ছিলো, হয়ত কোরআন তেলাওয়াত করছিলেন এবং দরুদ পাঠ করছিলেন। নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে আচমকা জিজ্ঞাসা করলাম, ভাই সূরা কাহাফ পড়েছেন? তিনি বললেন, হাঁ পড়েছি। তিনি এমনই আমলদার ছিলেন।

শত্রুদের গোলা বর্ষনকারী নিকটবর্তী ঘাঁটিগুলোকে মুজাহিদগণ পালাক্রমে নিয়ন্ত্রণ করতেন। পাল্টা আক্রমণ করে দমিয়ে রাখতেন। সেখানে পৌঁছে আবুল ওয়ালিদ নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। শেষ মুহূর্তে তিনি আক্রমণ স্থগিত করলেন আগামীকালের প্রস্তুতির জন্য। হঠাৎ একটি বোমা এসে তার প্রাণবায়ু উড়িয়ে নিয়ে গেল। তিনি শাহাদাত লাভে ধন্য হলেন।

আবুল ওয়ালিদ অনেক রোজা রাখতেন। তার রোজার কথা সবাই জানতো। প্রত্যেক সপ্তাহের বৃহঃস্পতি শুক্রবার এবং মাসের আইয়্যামে বীয তথা ১১,১২,১৩ দিনগুলো রোজা রাখতেন। এবং শাওয়ালের ছয়টি রোজাও রাখতেন।

এটা তার জন্য সৌভাগ্যের বিষয় ছিলো যে, তার বাবা মা তাকে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিতেন, বিভিন্ন সময় চিঠি পাঠিয়ে তাকে অনুপ্রেরণা দিতেন, সাহস যোগাতেন।

তিনি বালাপুর জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেই প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক শিক্ষা লাভ করেন। এরপর তিনি সৌদিতে রিয়াদে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে নির্মাণ-ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের লাগামহীন স্বাধীনতা এবং বিলাসিতা কিছুতেই তিনি গ্রহণ করলেন না। এশিয়ায় যে সকল প্রাণহীন রুসুম রেওয়াজ চালু আছে তা সব ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি নফসের সঙ্গে জিহাদ করতেন। মসজিদে গিয়ে

নামাজ আদায় করতেন। হৃদয়ের গভীর থেকে তিনি শুনতে পেতেন ঐশি কোন আওয়াজ– কে যেন তাকে খেতাব করে বলেছে, যে যুবক! ভুলে গেছো কি তোমার গৌরবময় ইতিহাস, তোমার মুসলিম ভাই, বোন আজ নির্যাতিত নির্বাসিত, তাদের ভিটে মাটি শত্রু কবলিত। তুমি এখনও ঘুমিয়ে আছো নির্বিঘ্নে.। কোথায় সেই ঈমানী হুংকার যার তোড়ে কেঁপে উঠতো রোম পারস্যের রাজসিংহাসন। তিনি তার ভিতরের ডাকে সাড়া দিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করলেন, ছুটে এলেন জিহাদের ময়দানে। অবশেষে জীবন বাজি রেখে লড়াই করে শাহাদাত লাভে ধন্য হলেন।

শহীদ আবু ফাহাদ মক্কী

জিদ্দার সাগরপাড়ের ছেলে আবু ফাহাদ। সকাল যার সন্ধ্যা হয় জাহাজ-স্টীমারের আনাগোনা দেখে। যার দিন-রাত কাটে সাগরতীরে বিশাল বিশাল ঢেউ আছড়ে পড়তে দেখে। সমুদ্র-সৈকতের সে দৃশ্য দেখে মন উতালা হবে যে কারো। কিন্তু আবু ফাহাদ এ দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ড়েছে। সৈকতের সেই বালুর চিকচিকি এখন তাকে আর আকৃতি করে না। সকাল-সন্ধ্যার ক্ষণস্থায়ী জাহাজ তার হৃদয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে না। বরং তার মনে শুধু একটা প্রশ্ন ঘুরে ফিরেই আসে– এমন কোন জাহাজ কি কখনো নোঙ্গর করবে জিদ্দার বন্দরে, যা আমাকে নিয়ে যাবে চিরশান্তির সবুজ দ্বীপে। মহান রবের পরম সান্নিধ্যে কিংবা অন্তত পৌঁছে দেবে আফগানিস্তানের ভূমিতে, যেখানে পাহাড়ে-মরুতে সাক্ষাৎ মেলে শুভ্র মেঘমালার, যার আড়ালে থাকেন ফিরিশতা, কিংবা স্বয়ং আল্লাহ!

আফগানিস্তানে যেতে তার একটাই সমস্যা। অসহায় স্ত্রী ও ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা। এই অসহায় বনী আদমদেরকে কার বিস্ময় রেখে যাবে! হঠাৎ তার মনে পড়ল হযরত সাইদ ইবনুল মুসাইয়াব রহ.-এর ঘটনা। তিনি বৃদ্ধ বয়সে একচোখে সমস্যা নিয়ে জিহাদে বের হয়েছিলেন। কেউ জিজ্ঞাসা করল, আপনিতো মা'যূর। তিনি বললেন, আল্লাহ যেহেতু স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক উভয় অবস্থায় বের হতে বলেছেন। তাই আমি বের হলাম। আমার পক্ষে যদি যুদ্ধ করা সম্ভব না হয় তাহলে অন্তত মুসলমানদের

সংখ্যাবৃদ্ধির কাজ তো হবে! তাছাড়া আমি যে মুজাহিদদের সামান পাহারা দিতে পারব।

আবু ফাহাদ সিদ্ধান্ত নিল স্ত্রী-সন্তানকে আল্লাহর হাওয়ালা করে আল্লাহর পথে বেরিয়ে পড়বে। এরপর প্রাথমিক প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ সমাপ্ত করে খোস্ত অঞ্চলে পৌঁছে গেল। কিন্তু ওখানে পৌঁছে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ল এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি হল। এক রাতে সে স্বপ্নে দেখল, ফিরিশতারা তার জানাযা (খাটিয়ায়) বহন করে জান্নাতে নিয়ে যাচ্ছে। এটাকে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ মনে করল।

সুস্থ হয়ে সে যথারীতি অভিযানে অংশগ্রহণ করল। একবার শত্রুদের কেন্দ্র দখলের জন্য একটি বাহিনী পাঠানো হল। আবু ফাহাদও তাদের মধ্যে ছিল। এ যুদ্ধে তারা জয়ী হল এবং গণীমত হিসাবে ১৭টা (এ.কে ৪৭) ক্লাশিনকোভ ও ৫২ জন্য বন্দী লাভ করল। কিছু দিন পর আবু ফাহাদ আরেকটি অভিযানে অংশগ্রহণের জন্য আহমাদ কাসিম ইরাকী'র তত্ত্বাবধানে রওয়ানা হল, তখন তার চোখেমুখে ছিল হাসপাতালে দেখা স্বপ্নের রূপায়ন-প্রত্যাশার ঝলক। শাহাদাতের পর্দা ভেদ করে সে যেন সরাসরি জান্নাতের উন্মুক্ত দরজা দেখতে পাচ্ছিল। আর আল্লাহও তার সে আশা পূরণের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। আকস্মিক একটা চোরাগোপ্তা হামলার শিকার হয়ে সে শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করল।

শহীদ আলী কাদরী সালেহ

শহীদ আলী কাদরী সালেহ হলেন ইয়ামানের রাজধানী সান'আর অধিবাসী। ১৯৬২ সনে তার জন্ম। রণাঙ্গনে আসার সময় ঘরে তার স্ত্রী ও ফুলের মত ফুটফুটে তিনটা বাচ্চাকে রেখে এসেছে। এটা যে কত কঠিন পরীক্ষা তা বুঝবে শুধু আলী কাদরী'র আরেকজন বাবা। চর্মচক্ষু বন্ধ করে কল্পনার চোখে একটু দেখার চেষ্টা করুন– ছোট ছোট অবুঝ বাচ্চারা মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে আর জিজ্ঞাসা করছে কতদিন হল, বাবা এখনো আসছে না কেন? দুদিন পরে যখন ঘরে খাওয়ার কিছু থাকবে না, মা তখন বাচ্চাদের

কী বলে সান্ত্বনা দেবেন। কী দিয়ে তাদের ক্ষুধার যন্ত্রণা ভুলিয়ে রাখবেন? বাচ্চাদের নিয়ে কোথায় যাবেন, কার দরজায় গিয়ে দাঁড়াবেন? কিন্তু একজন মুজাহিদের সামনে এর চেয়েও কঠিন প্রশ্ন- আল্লাহর যমীন থেকে আল্লাহর দ্বীন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, মুসলমানদের রক্তে সাগর-নদী রঞ্জিত হচ্ছে, আবরু লুণ্ঠিত মা-বোনদের আহাজারিতে আকাশ-বাতাস ভারি হয়ে উঠছে। এমতাবস্থায় আমি বৌ-বাচ্চা নিয়ে ঘরে শুয়ে থাকি কীভাবে? সুতরাং সবাইকে আল্লাহর হাওয়ালা করে, জান্নাতে পুনর্মিলনের সুসংবাদ শুনিয়ে রওয়ানা হয়ে গেল আফগানিস্তানে। আলী কাদরী যে শিবিরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছিল সেটা স্থাপন করা হয়েছিল একটি জঙ্গলের ছায়াঘেরা পরিবেশে। মাথার উপরে নানা স্বাদের, নানা বর্ণের ফল ঝুলছিল। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে স্বচ্ছ পানির নহর। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের পাশাপাশি ঐ তাঁবুতে ছিল বিদগ্ধ আলেমদের একটি জামাত। বিশেষত প্রফেসর আব্দুল্লাহ, যার কাজই ছিল আরব যোদ্ধাদেরকে বিশেষভাবে প্রশিক্ষত করে গড়ে তোলা। তো এই জঙ্গল থেকে আশপাশের দূর-দূরন্ত এলাকায় অভিযান পরিচালনা করা হতো। গভীর রাত পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নানা তৎপরতা চলতে থাকত। কাবুল আর গজনীর মাঝে সংযোগ রক্ষাকারী মহাসড়কটি এই জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে গেছে। এই সড়কের দু'পাশেও চলে অত্যন্ত স্পর্শকাতর অভিযান। শত্রুদের ট্যাংক ও গাড়ীবহর লক্ষ্য করে হামলা চালানো এ অভিযানের মূল লক্ষ্য। প্রকাশ্যে শত্রুদের মুখোমুখি যুদ্ধ করার সময় প্রত্যেক মুজাহিদেরই মনে হয় এটাই তার জীবনের শেষ মুহূর্ত।

আল্লাহর খাছ মেহেরবানিতে এই অঞ্চল পরিদর্শনের সুযোগ হয়েছিল। রাস্তার দু'ধারে ট্যাংক-কামান আর শত্রুবিমানের ধ্বংসাবশেষ শত্রুদের করুণ পরিণতির সুস্পষ্ট সাক্ষ্য। রাস্তার পাশে কাদা মাটিতে ট্রাক চলার আলামত দেখা যাচ্ছে। যার অর্থ হলো মূল সড়কে চালানোর সাহস না পেয়ে কাঁচা রাস্তায় গোপনে চালানো হয়েছে। আর কাপুরুষ রুশ বাহিনীকে কখনোই নির্ভয়ে রাস্তায় চলতে দেখা যায় না।

শাহাদাত

৮/৭/১৯৮৮ রোজ শুক্রবার মুজাহিদরা প্রতিজ্ঞা করল, যে কোন মূল্যে আজ আমরা শত্রুবাহিনীর প্রধান ক্যাম্প জয় করব। সঙ্গে সঙ্গে আলীও বলে উঠল, আমিও শরীক হব এই গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে। যুদ্ধ শুরু হল। মুজাহিদরা একটু একটু করে অগ্রসর হতে থাকল। গভীর রাত পর্যন্ত যুদ্ধ চলতে থাকল। অবশেষে রাত দেড়টার সময় মুজাহিদরা আল্লাহু আসবাবের বিজয়ধ্বনি দিল। সবাই নিরাপদে সহীহ সালেম ফিরে আসছিল, হঠাৎ একটা গোলার কিছু স্প্রিন্টার উড়ে এসে আলী কাদরীর বুকে আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে সে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এবং এক মুহূর্তের ব্যবধানে শাহাদাতের ঈর্ষণীয় মর্যাদায় ভূষিত হল।

সহযোদ্ধারা আলীর জানাযা বহন করে নিয়ে আসল। চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল, হৃদয় থেকে রক্ত ঝরছিল। আর যবান থেকে কালিমা'র বর্ষণ চলছিল। সবশেষে উপত্যকার এক পাশে তাকে দাফন করা হল।

বিদায় বন্ধু আলী বিদায়! আমাদের সালাম পৌঁছে দিও নবীজীর রওজায়। আর তোমার স্ত্রী-কন্যা, জানি তাদের চোখের অশ্রু মোছার সাধ্য নেই কারো, তবে দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ যেন তাদের কাফীল হোন। পরকালে তুমি তাদের জন্য সুপারিশকারী হয়ো। জিহাদী জীবনকে গ্রহণ করে, শহীদী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে তুমি যেমন ইতিহাসের পাতায় স্মরণীয় হয়েছো, তেমনি ইতিহাসও তোমার মত বীরকে পেয়ে ঈর্ষান্বিত হয়েছে, আমাদের কামনা শুধু একটাই, আল্লাহ যেন তোমার শাহাদাতকে কবুল করেন- আমীন।

আল্লাহর অতিথীদের মাহফিলে

যাবতীয় প্রশংসা কেবল আল্লাহর। শান্তি ও করুণাধারা বর্ষিত হোক শেষ নবীর উপরে।

শান্তির সড়ক ধরে এগিয়ে চলেছে কাফেলা। শান্তিদাতা আল্লাহর উদ্দেশে। এভাবেই এক এক করে তারা পৌঁছে যাচ্ছে শান্তির আলয়ে, দারুস সালাম– জান্নাতে।

গুহা-গহবর হতে জেগে উঠেছে কেশর ফোলানো সিংহেরা। লাফিয়ে লাফিয়ে তারা সামনে বাড়ছে। তারা ক্রোধে উন্মত্ত। প্রচণ্ড বিভীষিকায় লালা ঝরছে তাদের ঠোঁট হতে। কাতর চোখে তারা খুঁজে ফিরছে আল্লাহর শত্রুদের। তাদের অভিব্যক্তি বলছে, যেন শিকার থাবার নাগালে পেলেই তাকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেবে। কবিতা-

প্রজ্জলিত অঙ্গারের ন্যায় রক্তাভ দৃষ্টির বাণ তারা নিক্ষেপ করেছে।
তারা প্রভুর তরে উৎসর্গিত করেছে নিজেদের।
তারা সর্বদাই শাহাদাতের জন্যে প্রস্তুত।
নিহত কাফেরদের শোনিতে তারা হতে চায় পূত ও পবিত্র।
এটাই তাদের একমাত্র আরাধনা।
তারা এ সাধনায়ই আকৃষ্ট,
সিংহ যেমন আকৃষ্ট ঘাড় মটকাতে।

হে আল্লাহ! আমরা জানতে পেরেছি, আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "আল্লাহর নিকট আগত প্রতিনিধি তিন ব্যক্তি, মুজাহিদ, হাজী ও ওমরাকারী।" [নাসায়ী, ইবনে হিব্বান]

হে আল্লাহ! তারা আপনার মেহমান। তাদেরকে সম্মান করুন ও উত্তম মেহমানদারী করুন। তারা স্বদেশভূমির মায়া ছেড়ে শুধুমাত্র আপনার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে আপনার নামকে বুলন্দ করার জন্যে আপনার দ্বীনের সহযোগিতায় পড়ে আছে আপনার দুয়ারে। তাদের কবুল করুন আল্লাহ।

তারা পরিবার-পরিজনের সঙ্গ ছেড়ে এসেছে জিহাদের ভালোবাসায়। সুতরাং তাদেরকে যখন কবরে ছেড়ে দেয়া হবে তখন আপনি তাদেরকে ভালোবাসা দিবেন। পেছনে পড়ে থাকা নারীও বসে বসে দিন গুজরানকারী লোকদের মাঝে থাকতে তাদের দম বন্ধ হয়ে আসছিলো। তাই তারা ছুটে এসেছে আপনার দ্বীনকে সুউচ্চ করার জন্যে। সুতরাং হে আল্লাহ! তাদের কবরকে করে দিন প্রশস্ত। তা ভরিয়ে দিন নূরের ফোয়ারায়।

আপনার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যে ব্যক্তি আখেরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকবে অন্তরের দিক থেকে আল্লাহ তাকে ধনী বানিয়ে দিবেন। তার দলকে ঐক্যবদ্ধ রাখবেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়া তাকে ধরা দিবে। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ার বিষয় নিয়ে উৎকণ্ঠিত থাকবে তার দুচোখে আল্লাহ দারিদ্র ও অভাব অনটন ভরে দিবেন। তার দলকে করে দিবেন বিভক্ত। দুনিয়া তার কাছে ততটুকুই আসবে যতটুকু তার জন্য তাকদীরে লিখিত রয়েছে।"

সুতরাং হে আল্লাহ! আপনার পথের এই মুজাহিদদের মাঝে আপনি একতা এনে দিন। যারা আপনার অসহায় বান্দাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে। যারা পৃথিবীতে আপনার দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে। হে আল্লাহ! তাদের পাপসমূহ আপনি মোচন করে দিন। তাদের পাপের স্থানে নেককাজের সওয়াব দান করুন। শহীদদের কবুল করুন। গাযীদের আপনার তত্ত্বাবধানে রাখুন। আপনিই সর্বশ্রোতা, অতি নিকটবর্তী।

কাফেলা এখন আল্লাহর অতিথীদের মাহফিলে প্রবেশ করবে
শহীদ আবু জান্দাল ফিলিস্তিনী (মারওয়ান শফীক আব্দুল জাব্বার ওজনী)

প্রায় দেড় বছর আগে ১৯৮৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রচণ্ড উদ্যমী এক যুবককে দেখলাম। উদ্দিপনায় সে জ্বলছে। জীবনীশক্তিতে সে টগবগ করছে। তখন আমি সেনাবিভাগে প্রশিক্ষক হিসেবে কাজ করতাম। একদিন তাকে জিজ্ঞাসা করে বসলাম, কোথা হতে এসেছে হে যুবক! সে বলল- জন্মভূমি ফিলিস্তিন। এখানে এসেছি জর্দানে কিছুদিন থেকে।

আমি কৌতুহলী হয়ে বিস্তারিতভাবে তার সম্পর্কে জানতে চাইলাম। তখন সে বলতে লাগলো, "আমি জর্দানের আম্মান শহরে দন্তচিকিৎসক হিসেবে কাজ করতাম। এভাবেই চলছিলো আমার দিন। কিন্তু একসময় এই উদ্দীপনাহীন জীবনে অতীষ্ট হয়ে উঠলাম। একঘেঁয়েমিতে ভুগতে লাগলাম। আমি গভীরভাবে লক্ষ্য করলাম, গবাদি পশুদের জীবন ও আমাদের জীবনের মাঝে কোন পার্থক্যই নেই। তাদের মতো আমরাও খাচ্ছি-দাচ্ছি, দিনে ঘোরাফেরা করছি। দিনশেষে ঘরে ফিরে আসছি। পানাহার আর সুখ-শান্তি ছাড়া আমাদের আর যেন কোন চিন্তাই নেই, দায় দায়িত্বও নেই। আমাদের অন্তরে কোনই উচ্ছাকাঙ্খা নেই। অমূল্য সম্পদের খোঁজে জীবনের পানি একটু ঘোলা করতে যেন আমরা বড়ই নারাজ।" তার এই অল্প কথা হতেই তার ভেতরকার তড়প ও জযবার মাত্রাটা ধরে ফেললাম। সে আরো কিছুদিন সৈন্যবাহিনীতে থেকে তার পূর্ণ প্রস্তুতি সেরে নিলো। এখন তার লাল ভল্লুক ও তাদের পা চাটা গোলাম আফগানী কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে লড়ার পালা।

তার প্রথম অভিযান ছিলো নুরিস্তানের উদ্দেশ্যে। পাকিস্তানের সীমান্ত ঘেষে নুরিস্তান অবস্থিত। কিছুদিন পর সে ফিরে আসলো। ততদিনে আফগানী যুবকদের মতো তার বাবরী চুল কাঁধ স্পর্শ করেছে। এখন সে আরো উত্তপ্ত কাফেলা ও উত্তেজিত ময়দানের খোঁজে ব্যাকুল।

দ্বিতীয়বার সে দীর্ঘ এক অভিযানের নকশা আঁকছিলো। এমন সময় তার ডাক এসে গেলো জালালাবাদের উদ্দেশ্যে। সিংহসম সাহসী যোদ্ধবাজদের

সাথে লড়াইয়ের ময়দানে সে অতিবাহিত করলো প্রায় সাত মাস। এই কষ্টের সওয়াব আশা করি তার মিজানের পাল্লাকে ভারি করে তুলবে।

তার তৃতীয় অভিযান ছিলো খোস্তের উদ্দেশ্যে। সেখানে জ্বলন্ত আগুনের মাঝে থেকে, সে লড়াই করে গেছে। তখন সে শাহাদাতের খোঁজে তীব্রভাবে দৌড়াদৌড়ি করছিলো। প্রত্যেক প্রত্যাশিত স্থানে শাহাদাতকে খুঁজে ফিরছিলো। কিন্তু জীবন ও জীবনের সময়সীমা তো নির্ধারিত। এই সময়সীমা অজ্ঞতার রহস্যে আবৃত।

আল্লাহর আদেশ ব্যতিত কারো মৃত্যুবরণ করার অধিকার নেই। (তার সময়সীমা লিখিত রয়েছে) মেয়াদ নির্ভর কিতাবে। কবিতা–

আক্রমণের আগ মুহূর্তে সিংহকে যেমন ঢেকে রাখে ঝোপঝাড়,
তেমনি স্বপ্নের বর্শারা ঘিরে রেখেছে তাদের।
তারা অশ্লীলতা হতে নিজেদেরকে রেখেছে পবিত্র,
তারপর পবিত্র আত্মাকে ক্ষত বিক্ষত করেছে উচ্চমর্যাদার অভিলাষে।

ফিলিস্তিনের প্রতি তাঁর হৃদয়ের টান

ফিলিস্তিনের কথা প্রচণ্ডভাবে তাকে ভাবিয়ে তুলতো। কতবার আমার সাথে কথা বলার প্রারম্ভে এই বাক্যটি সে বলেছে, "ফিলিস্তিন আমাদের প্রতীক্ষায় রয়েছে।" তার কথার পিঠে আমি বলতাম, "আমি আশা করি, আল্লাহ আগে আমাদেরকে আফগানিস্তান বিজয় দান করবেন। এবং এই বিজয়ের সূত্র ধরে খুলে দিবেন ফিলিস্তিনের সীমান্ত ফটক।" কিন্তু আমার এই সোজাসাপ্টা কথা তার তীব্র পিপাসাকে শান্ত করতে পারতো না। কোন সন্দেহ নেই, আফগানিস্তানের জিহাদ ফরজে আইন। এ বিষয়ে আমার সাথে তার কোন বিরোধ ছিলো না। কিন্তু তার ধারনায়, আগে পবিত্র ভূমি ও মসজিদে আকসাকে ইহুদিদের নগ্ন অপবিত্র পদচারণা হতে মুক্ত করাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। প্রবল আগ্রহে সে ফিলিস্তিনে যাবার পথ খুঁজতে লাগলো।

কিছুদিন সে নিখোঁজ থাকলো। কিন্তু ফিলিস্তিন যাবার পথ পেলো না। কারণ, সীমান্ত আবদ্ধ। আর এ অবস্থায় যাওয়ার চেষ্টা পুরোপুরিই নিস্ফল। নতুন করে সে একদিন আফগানিস্তানের জিহাদে ফিরে এলো। কারণ জিহাদের ময়দান ছাড়া বেশিদিন সে থাকতে পারে না। সাদা কাফন, বন্দুকের ঝলকানি, অশ্বের হ্রেষাধ্বনি এসবই তার জীবনের সাথে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

তার চতুর্থ অভিযান ছিলো জালালাবাদের উদ্দেশ্যে। যুদ্ধের আগুন সেখানে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। অশ্বগুলো হয়ে উঠেছে উত্তপ্ত। ১১ই ফেব্রুয়ারী সে জালালাবাদ হতে পেশোয়ারে স্থানান্তরিত হয়। অল্প কিছু প্রস্তুতি নিয়ে সে রওয়ানা হয়ে যায় ১৬ই ফেব্রুয়ারী কাবুলের উদ্দেশ্যে। আবু হুজাইফা জর্দানীর সাথে এক গাড়িতে করে সে যাচ্ছে। এমন সময় গাড়ি উল্টে গিয়ে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আবু জান্দালের রূহ তখন আল্লাহর নিকট চলে যায়। আবু হুজাইয়া অজ্ঞান হয়ে পড়েন। আবু জান্দালের এই মত্যু নিশ্চিতই শাহাদাত। আল্লাহর পথেই এই জীবনদান। সহীহ হাদীসে এসছে, "যে আল্লাহর রাস্তায় বের হলো, অতঃপর মারা গেল বা নিহত হলো কিংবা তার উট, ঘোড়া তাকে আছাড় মারলো অথবা বিষাক্ত সাপ তাকে দংশন করলো কিংবা বিছানায়ই সে মৃত্যুবরণ করলো– যেভাবেই হোক– সে শহীদ। এবং তার জন্য রয়েছে জান্নাত।" [আবু দাউদ, হাসীম]

সহীহ হাদীসে আরো এসেছে, "আল্লাহর পথে যে পাহারাদার হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে, কবরে আল্লাহ তার আমলের সওয়াব ও রিজিক অব্যাহত রাখবেন। কবরে সে আযাব হতে নিরাপদ থাকবে। নিশ্চিন্ত অবস্থায় কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে উত্থিত করবেন।" [ইবনে মাযাহ]

শহীদ আবু হুজাইফা জর্দানী (ইয়াসীন হামদান আব্দুশ শাকুর আল-হাসায়িদা)

সে জর্দানের এক সম্ভ্রান্ত ও বৃহৎ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিল। সে এখন তার বংশের গর্ব। তার জন্মস্থান কার্কের অন্তর্গত কছর শহরটি তার মতো একজন বীরকে জন্ম দিতে পেরে গৌরবান্বিত হয়েছে। উজ্জ্বল তার চেহারা। সম্ভ্রমের আধিক্য তাকে দান করেছে সমীহ ও ভারসাম্য। বাকস্বল্পতা তাকে দান করেছে ঔজ্জ্বল্য ও গাম্ভির্য। কবিতা-

প্রচণ্ড সহনশীলতার দরুন মনে হয়,
তারা বধির– অশ্লীল কথা হতে,
পঙ্গু– অশ্লীল কাজ হতে।
লজ্জা ও সম্ভ্রমের দরুন তাদেরকে দেখা যায় দুর্বল, রোগা।
কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে এদেরকেই দেখা যায়,
গুহা হতে বেরিয়ে আসা দুর্দান্ত সিংহশাবক।

একাধিকবার আমি তাকে মুসলিম উম্মাহ ও তার পরিণতি নিয়ে চিন্তামগ্ন দেখেছি। ইসলাম ও এর ভবিষ্যতের চিন্তা তার অন্তরকে করে রেখেছিলো আচ্ছন্ন। ইসলামের জন্যই সে বেঁচে থাকতে চাইতো। ইসলামের জন্যই সে উৎসর্গ করে দিয়েছিলো আপনাকে, আপনার হৃদয় ও আত্মাকে।

সর্বদাই তাকে দেখা যেত মধুর সুরে বিশুদ্ধ লাহানে কোরআন পাঠে মগ্ন অবস্থায়। সোমবার ও বৃহস্পতিবারে যদি তাকে আহারের জন্য ডাকা হত, তাহলে মুচকি হাসি দিয়ে তার চুপ থাকাটাই আমাদেরকে জানিয়ে দিত যে, সে রোজা রেখেছে। তারতীল, তাজবীদ, মাখরাজ, সিফাত ইত্যাদি বিষয়ে তার পাণ্ডিত্ব ছিল ঈর্ষা করার মতো। রাতের আঁধারে অধিকাংশ সময় তাকে দেখা যেত আল্লাহর সমীপে তাহাজ্জুদ নামাজে রত।

তরুণ বয়স থেকেই সে ইসলামী দাওয়াতের এক উৎসর্গিত সন্তান। আল্লাহর শত্রুদের প্রতি প্রবল ঘৃণা যৌবনেই তার রক্ত-মজ্জায় গিয়েছিলো

মিশে। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়ার সময়েও শুনেছি সে টিফিনের ছুটি কিংবা অন্য কোন অবসর পেলেই সমবয়স্কদেরকে ইসলামের বাণী শোনানোর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়তো। তাদেরকে ন্যায় ও সত্যের পথে পরিচালিত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেত।

বেদআতীদের 'ওয়ালা' (আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতার আকীদা) ও 'বারা' (ওলীদের নিষ্পাপ হওয়া) আকীদা হতে সে ছিলো পুরোপুরিই সতর্ক। ছোটবেলা থেকেই তার মাঝে জিহাদী চেতনা ছিল প্রদীপ্ত। তখনই সে তারকাঁটা, ঝীলক একত্র করে কম্যুনিস্টদের আগমন পথে রেখে দিতো।

আর নাসারারা ছিলো তার দুচোখের বিষ। তাদেরকে দেখা, তাদের কোন কথা শোনা– সে একদমই সহ্য করতে পারতো না।

যখন সে জিহাদের ডাক শুনলো তখন যেন আগ্রহের আতিশয্যে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে চলে এলো জিহাদের ময়দানে। তাবু গাড়লো আফগানিস্তানের সীমান্ত প্রদেশে– জিহাদের প্রশিক্ষণ নেবার জন্যে। তারা ছিলো তিনজন। আবু হুজাইফা, আবু মুতাসেম, আবু সুহাইব। তাদের মনের কথা যেন ছিলো-

মালিক! এমন ভাইদের সঙ্গ আমি পেয়েছি,
যাদেরকে সান্ত্বনা দিতে পারেনি কোন কিছুই।
যদি সাধ্য থাকতো তবে তাদের হৃদয়গুলো দেহকে ফাঁকি দিয়ে
প্রবল প্রেমে আলিঙ্গন করতো তোমার সাথে।

যে ময়দানেই সে প্রবেশ করেছে অগ্রগামিতার স্বাক্ষর রেখেছে সেখানেই। জ্ঞানের জগতেও সে অগ্রগামীরূপেই পরিচিত ছিলো। জর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি পেছনে ফেলে সে ছুটে এসেছে অন্য এক মহান ডিগ্রির আশায়। এমন সনদের খোঁজে সে এখানে ছুঁটে এসেছে যার মাধ্যমে সে জান্নাতে ঠাঁই পাবে। এমন সনদ সে আর চায় না যা তাকে দুনিয়ার অন্ধকার ও লোভ-লালসার জগতে ঢুকিয়ে দেয়।

প্রশিক্ষণকেন্দ্রে তার উদ্যম, স্পৃহা ও আগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো ছিলো। তাকে দেখে খোদ প্রশিক্ষকই আশ্চর্যান্বিত হতেন। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে সে সাথীদেরকে কোরআনের দরস দিতো। কারণ, সে ছিলো কোরআনের হাফেজ এবং তাজবীদের ক্ষেত্রে শায়খদের থেকে বিশেষ সনদপ্রাপ্ত।

প্রশিক্ষণ শেষে যখন সে বাস্তব যুদ্ধক্ষেত্রে চলে এলো তখন তার জিহাদের প্রেম, শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা বহুগুণ বেড়ে গেলো। সেই প্রেমপোড়া হৃদয় নিয়ে এক চিঠি সে লিখলো তার এক বন্ধুর উদ্দেশ্যে- যার নাম আব্দুল হাই শফিক মুজালী। সেই চিঠিতে সে যা লিখেছিলো তা নিম্নরূপ–

"হে বন্ধু! বিদায়ের সময় আমি তোমাকে বলে আসিনি। তাই বলে ভেবোনা, আমি তোমায় ভুলে গিয়েছিলাম। আমি তোমায় অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে ভালোবাসি। আমার সফরের কথা তোমাকে মুখে বলিনি ঠিক। কিন্তু হৃদয়ের ভাষায় তোমাকে বলে এসেছি। তুমি তা বুঝতে পারলে না। আল্লাহর দুয়ারে অসংখ্যবার দুআ করেছি, যেন আল্লাহ তোমাকে আমাদের কাছে পৌঁছে দেন। এখানে এলে তুমি বুঝতে পারবে, জীবন কাকে বলে। ঈমানের মর্ম কী। মুসলমানের সম্মান ও মর্যাদা কীসে লুকায়িত।

তারপরের যে কথা তা হলো– আমি ও আমার সাথীরা খুবই ভালো আছি বন্ধু। অসংখ্য নেয়ামতে ডুবে আছি সর্বক্ষণ। আনন্দ আমাদের সর্বদাই। আমরা তো আল্লাহর খুব কাছের মানুষ। তিনি আমাদেরকে আপন সৈন্য হিসেবে মোতায়েন করেছেন। বিশ্বাস করো বন্ধু! আমি জিহাদের ময়দানে এসে সুস্পষ্টভাবে অনুধাবন করেছি, জর্দানে এতদিন আমরা ইবাদতের নামে আল্লাহর সাথে লুকোচুরি খেলেছি। দিনের আলোর মতো আমার কাছে এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে, কোরআন আমাকে কী বলতে চায়। ইসলাম আমাকে কী আদেশ দেয়। ভ্রাতৃত্বের দাবি কী? সকল প্রশংসা আল্লাহর।

ইয়াসিন ও তার মা

'কী হলো তোমার হে ইয়াসিন! তোমার মাকে কেন তুমি এত কাঁদাচ্ছো? কেন তার রাতের ঘুম হারাম করে দিয়েছো? তাঁর ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু দেখেও কি তোমার একটু মায়া হয় না? তাঁর ভগ্ন হৃদয়ের প্রতি কি তোমার একটুও দয়া হয় না? তোমার হলো কী? তুমি তাঁর কথা শুনছো না, অথচ সে কল্পনায় আঁকা তোমার ছবিকে সর্বদাই কাছে ডাকছে? সে যেন বলছে-

'তোমাকে বিদায় জানানোর পরই আমি বুঝতে পারছি
শয়নক্ষেত্র হতেও গজিয়ে ওঠে সুঁই আর কাঁটা।
হে প্রতিপালক! দীর্ঘ রাত জেগে জেগে আমি তার প্রতীক্ষা করেছি।
সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়ার পরও আমার প্রতীক্ষার হয়নি শেষ।'

তুমি কি তার রোগাক্রান্ত দেহের প্রতি একটুও রহম করবে না?

মাঝে মধ্যেই এমন অনেক আবেগমাখা তার মায়ের চিঠি তার কাছে আসতো। চিঠিতে থাকতো দুঃখভারাক্রান্ত মন ও এক প্রেমিক জননীর ভালোবাসার কথা। যখনই চিঠির মাধ্যমে সে জানতে পারতো, তার মায়ের ডায়বেটিকস ক্রমশ বেড়েই চলেছে, তখন জবাব লিখে পাঠাতো, "আমার 'প্রতীক্ষিত বিষয়'ও আমার খুব নিকেট চলে এসেছে।"

একদিন ইয়াসিনের দুর্ঘটনার সংবাদ পেলাম। হাসপাতালে তাকে দেখতে গেলাম। অসহায়ভাবে সে বিছনায় পড়ে আছে। তাকে ঘিরে আছে তার সঙ্গী সাথীরা। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম বিনিময় দান করুন। কারণ পেশোয়ার কলেজ হাসপাতালে তারা রাত-দিন তার সেবায় নিয়োজিত ছিলো। এরপর ভাই আবুল হাসান মাদানী তাকে ইসলামাবাদের উন্নত হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলো। যাতে উন্নত সেবায় দ্রুত সে সুস্থ হয়ে উঠে। কিন্তু তার চিকিৎসক বললো, তার অবস্থা খুবই গুরুতর। এ অবস্থায় নড়া-চড়া করানো ঠিক হবে না।

দুর্ঘটনার চতুর্থ দিন আছরের পর (শনিবার ২০ এ রমজান মুতাবেক ২৫ শে ফেব্রুয়ারী) আবু সুলাইম আমার কাছে আবু আব্দুল্লাহ উসামার বাসায় এলো। ইয়াসিন সম্পর্কে বলল, তার রূহ তার সৃষ্টিকর্তার কাছে চলে গেছে।

হাসপাতাল হতে তার লাশ বাড়িতে আনা হলো। গোসল করিয়ে কাফন পরানো হলো। খাটিয়ায় করে আমার দরজার সামনে শহীদদের কবরস্থানে রাখা হলো। সেখানে তার জানাযার নামায পড়া হলো। অতপর তাকে নিয়ে যাওয়া হলো তার সর্বশেষ গন্তব্যে।

চিরন্তন ঘরে

শহীদদের করবস্থানের একপাশে তার কবর খোদা হলো। তাকে শোয়ানোর জন্য আমি নিজেই কবরে নামলাম। আমার সাথে ছিলো আবু খালেদ। তার মুখ যখন খোলা হলো তখন তা দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এরই মধ্যে তার তিনটি কারামত আমি দেখে ফেলেছি।

এক. আমি তাকে আলোকোজ্জ্বল এবং অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন দেখেছি। তার মুখমণ্ডলে অবাক করা নূর চমকাচ্ছে। এটা দেখার সাথে সাথে নিজেকে আর ধরে রাখতে পারিনি। আমি পরম আবেগে বলে উঠেছি, সুবহানাল্লাহ!

দুই. তার দেহকে আমি উষ্ণ বরং বলা ভালো উত্তপ্ত পেয়েছি। অথচ পূর্বে আমার অভিজ্ঞতা ছিলো, মৃত লোকের দেহ শীতল হয়।

তিন. তার দেহকে অনেক হালকা পেয়েছি, যেন সে ঘুমিয়ে আছে।

তার মুখখানি আমি কিবলার দিকে ফিরিয়ে দিলাম। মাটি দিয়ে ঢেকে দিলাম তার দেহ। এরপর আমার চোখ বন্ধ হয়ে এলো। আল্লাহর কাছে চলে যাওয়া যুবকদেরকে দেখতে পেলাম। নিজের কাছে নিজে অনেক ছোট হয়ে গেলাম। হায়! এরা যদি আমার চেয়ে আল্লাহর দরবারে অধিক মকবুল নাই

হতেন তাহলে তো আল্লাহ আমার পূর্বে এদেরকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতেন না। এটা আমার ধারণা। বাকি সবকিছু আল্লাহই ভালো জানেন।

তার জন্য আল্লাহর দরবারে দোআ করে তাকে বিদায় জানিয়ে এলাম। সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলো, অথচ তার বয়স বিশ বছরও পেরোয়নি। আমি আশা করি, আল্লাহ আমাদেরকে সৎকর্মশীলদের মাঝে অন্তর্ভূক্ত করে নিবেন।

শহীদ আবুল বারা মাদানী (আহমাদ আব্দুল আযীয আর-রাকুয)

“ভালো যত গুণ আছে সবই তার মাঝে বিদ্যমান।”– এভাবেই তার বর্ণনা শুরু করেছে তার সেনাপতি আবু উবায়দা। সে আরো বলেছে তার সম্পর্কে– “হালকা-পাতলা যুবক। হাস্যোজ্জ্বল মুখ। রাতজাগা ভাইদের খেদমতে অগ্রগামী। তার পূর্বে কেউ ফজরের আজান দিতে পারতো না। শেষ রাতে জেগে সে মুজাহিদ ভাইদের জন্য পানি গরম করতো। পরে আজান দিতে যেতো। আজানের আগে ও পরে সে সকলকে নামাজের দিকে বারবার আহ্বান করতে থাকতো। প্রায় সর্বদাই তার সঙ্গে কোন মুসহাফ থাকতো। সময় পেলেই সে তেলাওয়াত করতো।” কারণ এটাই তো মূল শক্তি, জিহাদের প্রকৃত প্রস্তুতি তো এর মাধ্যমেই।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

অর্থঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর ও সালাতের মাধ্যমে শক্তি অর্জন করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। [সুরা বাকারা-১৫৩]

কবি বলেন-

গাইরুল্লাহ যদি কারো শক্তি অর্জনের মাধ্যম হয়,
তাহলে চারদিক হতেই তাকে পাকড়াও করে বিপর্যয়।

মানুষ ও এই পার্থিব জগতের মধ্যকার সম্পর্ক কতটুকুই বা গভীর। মানুষ তো দুনিয়া নামক গাছের ছায়ায় ক্ষণিকের তরে বিশ্রামরত এক পথিক। ক্ষণিক পরেই ছেড়ে যেতে হবে এই গাছ। দুনিয়ার সাথে এমনই আচরণ করতে শিখিয়েছেন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই দুনিয়ার মূল্য তো আল্লাহর কাছে মাছির তুচ্ছ ডানার চেয়েও কম। মুসলিম শরীফে এসেছে- "নবীজি একবার এক মৃত ছাগল ছানার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এটা দেখে তিনি সাহাবাদের লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাদের কেউ কি এক দিরহামেরও বিনিময়ে এটা পেতে চাও?' তারা বললো, 'না, কেউ না।' তখন নবীজি বললেন, 'তোমাদের কাছে এটা যত তুচ্ছ আল্লাহর কাছে দুনিয়া এর চেয়েও অধিক তুচ্ছ'।"

আহমাদের চোখে দুনিয়া ছিলো ঠিক এমনই যেমনটা উপরে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তার একটা ঘটনা উল্লেখ করার মতো। একবার তার পাসপোর্ট হারিয়ে গেল। তখন নতুন পাসপোর্ট নেয়ার জন্য সে ইয়ামানী দুতাবাসে ধরনা দিলো। কিন্তু পাসপোর্ট তাকে দেয়া হলো না। তাকে বলে দেয়া হলো, নতুন পাসপোর্ট পাওয়ার জন্য ইয়েমেন ফিরে যেতে হবে। সেখান হতে ফিরে এসে সে পাসপোর্টের কথা ভুলেই গেলো।

মর্যাদার চূড়ান্ত সীমায় পৌছার প্রচেষ্টা

'হয়তো দুর্জয়ের জয়, নয়তো মৃত্যুর হাতে ক্ষয়,
ধৈর্যের দ্বারাই পাওয়া যায় আকাঙ্খিত বিষয়।'

১৯৮৭ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রথম সে জিহাদের ময়দানে অংশগ্রহণ করে। তার প্রথম অভিযান ছিলো খোস্তের উদ্দেশ্যে। এরপর থেকে অনবরত জিহাদ চালিয়ে যেতে থাকে। খোস্তে প্রতিদিন প্রতিনিয়ত অগ্নিযুদ্ধের মধ্যেও সে টিকে থাকে অটল পাহাড়ের মতো। ক্ষুৎ-পিপাসা, শত্রুদের তর্জন-গর্জন কিছুই তাকে ভীত করতে পারেনি।

**হৃদয় যদি উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়
তাহলে তুচ্ছ দেহের হয় ক্ষয়।**

আহমাদের প্রতি আবু হামেদ ইয়ামানীর ভালোবাসা

আহমাদের চাল-চলন, আখলাক-চরিত্র দেখে খুবই আশ্চর্যবোধ করে আবু হামেদ ইয়ামানী। অথচ আবু হামেদই এমন লোক, যার ধৈর্য তোমাকে অবাক করে দেবে। তার অবিচলতার সামনে নিজেকে খুব ছোট মনে হবে। সে তো জীবনের ষাট বসন্ত পেরিয়েও পড়ে আছে এই যুবকদের সাথে আল্লাহর পথে। কিন্তু আহমাদের বয়স একুশও পেরুয়নি। এই বয়সেই সে আপন চাল-চলন ও আখলাক-চরিত্র দ্বারা মানুষকে আকৃষ্ট করে ফেলেছে। তার কর্ম ও আচরণ সকলের জন্য শিক্ষণীয় বলে প্রতিভাত হয়েছে। তাই আবু হামেদ যখন কারো প্রশংসা করতে চাইতো তখন আমরা বুঝে ফেলতাম, আহমাদেরই প্রশংসা করা হবে। আবু হামেদের জীবনে স্বপ্নপুরুষ ছিলো এই আহমাদই। তার মনের কথা যেন ছিলো–

'বাগানের চারাগাছগুলি যেমন ভালোবাসে পাখিকে,
আমি তেমনি প্রবলভাবে তাকে ভালোবেসে ফেলেছি।'

তুরগুর পর্বতে

আহমাদ তার দুই সাথীর সাথে পরামর্শ করে মনস্থ করলো তুরগুর কালো পর্বতে মুজাহিদদের পতাকা প্রোথিত করবে। আহমাদ পতাকা প্রস্তুত করে নিজের হাতে বহন করে নিয়ে যেতে লাগলো। যখন কম্যুনিস্টদের ঘাঁটির কাছাকাছি পৌঁছলো তখন তারা সবাই পালিয়ে গেলো দুইজন ছাড়া। তারা বোমা নিক্ষেপ করলো মুজাহিদদের দিকে। তখন আহমাদের হাতসহ অর্ধেক দেহ উড়ে গেলো। উড়ে গেলো পতাকাটাও। আর দুজন হলো মারাত্মক আহত। আহমাদের মৃত্যুতে সকলেই অত্যন্ত দুঃখিত হলো। তার বিদায়ে আমার মনে পড়ে গেলো বুহতুরীর বিখ্যাত পঙক্তিটি–

'মর্যাদার দিক থেকে মানুষে মানুষে কত বিভেদ,
কখনো হাজার লোকের তুলনায় এক ব্যক্তিই হয়ে যায় শ্রেষ্ঠ।'

মহান আল্লাহ ভাই আহমাদের প্রতি দয়া করুন। তার হিজরত, তার জিহাদকে কবুল করুন। জান্নাতের সুউচ্চ মর্যাদায় তাকে আসিন করুন।

“নিঃসন্দেহে জান্নাতে একশত মর্তবা রয়েছে, যা আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য তৈরি করেছেন।” [সহিহ বুখারি]

শহীদ আব্দুল আযীয আব্দুস সামাদ আল মালেকী

পৃথিবীর প্রান্তরে প্রান্তরে যারা বুকের রক্ত ঢেলে মুসলিম উম্মাহর দেহে জীবন দান করেছে, আব্দুল আযীয তাদের একজন।

আব্দুল আযীয জিহাদের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। জান্নাত লাভের আশা ও শাহাদাত লাভের অদম্য আকাঙ্ক্ষাই তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। মুজাহিদ বাহিনীকে একদিন পাহারা দেওয়াই তো অন্য জায়গা হাজার দিন পাহারা দেওয়ার চেয়ে বেশি সওয়াব।

তার আকাঙ্ক্ষা, সে যেন ময়দানেই মৃত্যুবরণ করে কিংবা শাহাদাত লাভ করে। প্রহরারত অবস্থায় যদি তার মৃত্যু হয় কিংবা নিহত হয় তাহলে সে শহীদী মর্যাদা লাভ করবে, তার আমলও জারি থাকবে, কেননা মৃত্যুর সাথে সাথেই সকলের আমল বন্ধ হয়ে যায়; তবে শহীদের আমল অব্যাহত থাকে এবং কবরের প্রশ্ন ও আযাব থেকেও নিরাপদে থাকে।

জিহাদের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে আব্দুল আযীয নিজেকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল, অস্ত্র-সজ্জিত হলো। এবং ওয়ারদাক, মায়দান, হানক অভিমুখে রওনা হলো।

আব্দুল আযীয রমযান মাসে ওয়ারদাক অঞ্চলে অবস্থান করে এবং মুজাহিদদেরকে পবিত্র কুরআন শিক্ষা দেয়।

বরকতপূর্ণ স্বপ্ন

আব্দুর রহমান সিন্দী একদিন ঘুমের মধ্যে এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পেলেন, তোমাদের মাঝে আব্দুল আযীয নামে একজন ব্যক্তি আছে সে শাহাদাত লাভ করবে। আব্দুর রহমান আব্দুল আযীযকে চিনতেন না। তাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন তোমাদের মাঝে আব্দুল আযীয কে? একজন বলল, আমি আব্দুল আযীয। তখন তাকে বললেন, তুমি শাহাদাত লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। এ স্বপ্ন তিনি আরো একবার দেখেন।

রুশ ও কমিউনিস্টদের দুরাবস্থা

রুশ ও তার কর্মীরা এখন হায়-হুতাশ করছে। ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিন পার করছে। জানিফচুক্তি ঘোষণার পর তাদের জন্য কেমন যেন মৃত্যু অপেক্ষা করছে।

তাদের একেকজনের কামনা, মা-বাবা, সঙ্গী-সাথী এমনকি পৃথিবীর সকলের বিনিময়ে হলেও যদি সে মুক্তি পেত।

মায়দান বিজয়

মুজাহিদগণ সিদ্ধান্ত নিল, তারা ওয়ারদাকের প্রধান শহর মায়দান আক্রমণ করবে। ওয়ারদাক কেন্দ্রীয় ভবন থেকে ত্রিশ কিলোমিটার দূরে।

আল্লাহ তায়ালা নির্ধারণ করে রেখেছেন প্রথম প্রদেশ। তাই আব্দুল আযীযের হাতে এটি শত্রুদের থেকে পূর্ণরূপে স্বাধীন হয়। প্রদেশটি মুসলিমদের অনেক উপকারে আসে, তার বিজয় ছিল এক বিশাল গণিমত।

আব্দুল আযীয তার শাহাদাত বরণের দিন সকালে আবু আসেম আত-তাবুকীকে বলল, আমি অনুভব করছি, আজকে আমি শহীদ হয়ে যাব। আল্লাহই ভালো জানেন।

১৯/১১/১৪০৮ হিজরীতে আল্লাহ তায়ালা আব্দুর রহমানের স্বপ্ন সত্য করলেন। যুদ্ধের মাঝে একটি গোলার ভগ্নাংশ এসে তার গায়ে লাগে। তাতে সে মারাত্মক আহত হয়।

এরপর সে মাত্র নয় ঘন্টা জীবিত থাকে, আহত হওয়ার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পূর্ণ সূরা বাকারা তেলাওয়াত করে।

অসিয়ত

আমরা তার ব্যক্তিগত কাগজ-পত্রের মাঝে একটি ওয়াসিতনামা পেয়েছি। তাতে লেখা আছে, আমার সামান-পত্র যেন কমাণ্ডারকে দিয়ে দেয়া হয়, তিনি তা সদকা করে দিবেন। আর অস্ত্র আমার ভাই আব্দুল ওয়াহহাবকে দিয়ে দিবেন সে যেন তা দ্বারা জিহাদ চালিয়ে যায়। আমার পিতাকে অনুরোধ করবেন তিনি যেন স্বদেশী জাতীয়তাবাদী দল ছেড়ে ইসলামী দলে প্রবেশ করেন।

শহীদ হানী আহমদ রশীদ আবু যোহায়রা

প্রধান ইসলামী মারকায ইসলামাবাদ

উমর রা. আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতেন, হে আল্লাহ! আপনার নবীর শহরে আমাকে শাহাদত দান করুন। [সহীহ বুখারী]

সাহাবায়ে কেরাম বিস্মিত হয়ে ভাবতেন, উমর রা. মদীনায় থেকে কীভাবে শাহাদাত লাভ করবেন। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা তার মনের অবস্থা জানতেন। জানতেন কাফেরদের সাথে তার লড়াই করার তীব্র আকাঙ্ক্ষার কথা, জিহাদের ময়দানে মৃত্যুর সাথে মুলাকাত করার ইচ্ছার কথা।

একবার উমর রা. ভাবলেন, এবার নিজেই মুজাহিদ বাহিনীর নেতৃত্ব দিবেন। নিজ হাতে কিসরা বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করবেন, কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম আপত্তি জানিয়ে বললেন, আপনি জিহাদে চলে গেলে রাষ্ট্র চালাবে কে, মুসলমানদের দেখাশোনা করবে কে?

কে জানত আল্লাহ তায়ালা তাঁর ভাগ্যে শাহাদাত লিখে রেখেছেন আল্লাহর নবীর মেহরাবের সামনেই। আল্লাহ তাঁর নবীর ভবিষ্যদ্বাণীও সত্য করেছেন। যে ভবিষদ্বাণী করে গিয়েছেন ওহুদের উপরে।

একদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওহুদ পাহাড়ের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন আবু বকর, উমর, উসমান ও আলী রাদিআল্লাহু আনহুম। হঠাৎ পাহাড় কেঁপে উঠল। তখন রাসূলুল্লাহ সা. বললেন, শান্ত হও ওহুদ! কারণ তোমার উপর দাঁড়িয়ে আছে একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দুইজন শহীদ।

এখন আমরা আমাদের প্রিয় ভাইয়ের শাহাদাতের কাহিনী শুনব। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী মারকাযকে যে শোকের সাগরে ভাসিয়ে যাবে। কাতারে জন্মগ্রহণকারী অনেক ফিলিস্তিনীর হৃদয় যাকে বিদায় জানাবে।

আমি কখনো কল্পনাও করিনি সে আমার পূর্বে মৃত্যুর পেয়ালায় চুমুক দিবে, অথচ সে আমার ছেলের বয়সের এক তাজা নওজোয়ান। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মাত্র অধ্যয়ন করছিল।

তবে শহীদি মৃত্যু অনেক মর্যাদার সমষ্টি। আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছা করেন শুধু তাকেই সে সব মর্যাদা দান করেন। আর জান্নাতে আল্লাহ মুজাহিদদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন একশত মরতবা। আল্লাহ যদি তার শাহাদাত কবুল করেন তাহলে আশা করি সে এই সমস্ত মর্যাদার অধিকারী হয়েছে। আমরা তার স্বভাবজাত লজ্জা ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ তায়ালার কাছে তার গুণগ্রাহী করব না।

আবু হুরায়রা রা. থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কীসের কারণে মানুষ জান্নাতে সবচে বেশী প্রবেশ করবে? আল্লাহর রাসূল বললেন, তাকওয়া ও উত্তম চরিত্র। তারপর জিজ্ঞাসা করা হলো, মানুষ সবচে’ বেশী জাহান্নামে যাবে কোন কারণে? বললেন, মুখ ও লজ্জাস্থানের কারণে। [সুনানে তিরমিযী, হাসান সহীহ]

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, এক ব্যক্তি সারাদিন রোজা রেখে সারা দিন দাঁড়িয়ে নামায পড়ে যে মর্যাদা লাভ করবে, মুমিন উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সে মর্যাদাই লাভ করবে। [আবু দাউদ]

যে ব্যক্তি সঠিক হওয়া সত্ত্বেও বিবাদে জড়াবে না আমি তার জন্য জান্নাতের উপকণ্ঠে একটি বাড়ির যিম্মাদার হয়ে যাব।

যে আপন চরিত্রকে উত্তম করবে তার জন্য আমি জান্নাতের উঁচু স্থানে একটি বাড়ির যিম্মাদার হয়ে যাব। [সুনানে আবু দাউদ]

সহীহ বুখারীতে আছে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, লজ্জা পুরোটাই কল্যাণকর।

আবু যোহায়রা ছিল স্বল্পভাষী, অধীক লজ্জাশীল। তার সাথে কেউ কথা বললে তার চেহারার দিকে তাকাতে পারত না। হয়ত ঘৃণার কারণে কিংবা সম্মানার্থে। যতটুকু প্রয়োজন ততটুকুই কথা বলত। যদি সে ভিন্নমত পোষণ করে তাহলে সে ব্যাপারে কারো সাথে তর্কে জড়াতো না। বরং চুপ থাকত। একমত হলে ইশারায় সমর্থন জানাতো। এবং অস্পষ্ট আওয়াজে কিছু বলত। তার মুচকি হেসে কথা বলা সবাইকে মুগ্ধ করত, এমনকি ক্লান্ত-অবসাদগ্রস্থ ব্যক্তিও বিরক্তি বোধ করত না।

আমি যুবকদের দেখতাম তারা অবসর সময় কাটাতো জিহাদের ময়দানে যাওয়ার তীব্র আগ্রহের মাঝে ও পারিবারিক ব্যস্ততার মাঝে। ময়দানে যাওয়ার সুযোগ পেত না। কিন্তু যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকত তখন তারা কোন সুযোগে নিকটবর্তী কোন ফ্রন্টে নিজেদের আগ্রহের আগুন নিভিয়ে আসত।

আবু যোহায়রা গ্রীষ্মের জন্য অধীর হয়ে অপেক্ষা করত জিহাদের পিপাসা নিবারনের জন্য। জিহাদের তীব্র আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য আমি তাকে অনেক সময় মুজাহিদদের আস্তানায় দেখতাম।

আল মারকাযুল ইসলামী, ইসলামাবাদে অবস্থান

বিদ্রোহী বামপন্থীদের কবলে পড়ে বিপথগামী অনেক ফিলিস্তিনী যুবককে আফগানিস্তানের জিহাদে আনার ক্ষেত্রে আবু যোহায়রার সক্রিয় ভূমিকা ছিল। এই প্রশস্ত মারকায ও বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটে দিশেহারা কত যুবককে আল্লাহর পথে ফিরিয়ে এনেছেন। সত্যের রাজপথে চালিত করেছেন। তাদের মনে এই মহান দ্বীনের প্রতি বিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন, যেন উদ্ধারকারী বা মুক্তির পথ হয়ে অবতীর্ণ হয়েছেন।

আজ এই সিংহপুরুষকে হারিয়ে আমরা কীভাবে মারকাযে যাব?

আবু যোহায়রা কান্দাহার অভিমুখে রওনা হলো। যেখানে যুদ্ধের আগুন জ্বলছে। কমিউনিস্টদের কোন কেন্দ্রে মুজাহিদ বাহিনী আক্রমণ করবে, সিদ্ধান্ত নিল।

আক্রমণ করলে কমিউনিস্টরা আত্মসমর্পণ করল। কেন্দ্রের সবকিছু মুজাহিদদের গনিমত হলো। তাদের সবাইকে বন্দি করা হলো। কিন্তু কমিউনিস্টদের নিকটবর্তী আরেকটি কেন্দ্র থেকে গোলাবর্ষণ শুরু হলো। একটি গোলা এসে আবু যোহায়রার কাছে পড়ল। তিনি জ্বিলহজ্বের আট তারিখ ১৪০৮ হিজরী পক্ষান্তরে ২/৭/১৯৮৮ ইং যোহরের নামাযরত অবস্থায় প্রভুর সান্নিধ্যে চলে যান।

আমাদের আশা আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করেছেন। এবং তার রূহ সবুজ পাখিতে চড়ে যেখানে খুশি বিচরণ করছে। বিচরণ শেষে আরশের নিচে ঝুলন্ত প্রদীপে আশ্রয় নিবে।

আল্লাহর কাছে শহীদের জন্য সাতটি প্রতিদান রয়েছে–

এক. দেহ থেকে প্রথম রক্তের ফোঁটা ঝরার সাথে সাথে তার সকল গুনাহ মাফ করে দিবেন।

দুই. জান্নাতের বাসস্থান দেখতে পাবে।

তিন. কবরের আযাব থেকে মুক্তি পাবে।

চার. হাশরের ভীতি থেকে মুক্ত থাকবে।

পাঁচ. সম্মানের তাজ পরিধান করবে। যার একটি ইয়াকুত পাথর পৃথিবী ও তার সকল কিছু থেকে উত্তম, দামী।

ছয়. বাহাত্তরজন আয়তলোচনা হুরের সাথে বিবাহ হবে।

সাত. পরিবারের সত্তরজনের ব্যাপারে সুপারিশ করবে।

আল্লাহর কাছে কামনা করি, শাহাদাত থেকে যেন আমাদের বঞ্চিত না করে। সালেহীনদের সাথে যেন যুক্ত করে।

শহীদ পরিবারের প্রতি উপদেশ

হে শহীদ মাতা! আপনি অধৈর্য হবেন না, বরং গর্ব করুন যে, আপনার ছেলে একজন বীর, একজন শহীদ। আমাদের কামনা, আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করবেন। কিয়ামতের দিন সে আপনার পরিবারের মাফী হবে। মা! ধৈর্যচ্যুত হবেন না। আপনার সন্তানের মত ছেলেরা আগামী প্রজন্মের গর্ব, যুবকদের আদর্শ, উম্মাহর দুর্যোগ ও সঙ্কটের সময় আল্লাহর পথেই যখন তার মৃত্যু হয়েছে তখন আর কেঁদে কেঁদে নিজেকে শেষ করবেন না।

হে শহীদ ভগ্নিগণ! তোমরা সম্মান ও গৌরবের সাথে মাথা উঁচু করে চলো। তোমরা ব্যথিত ও দুঃখিত হয়ো না, এবং এই ভেবে অশ্রুপাত করো না যে, তোমাদের ভাই হারিয়ে গেছে। বরং আগত প্রাপ্তির জন্য আনন্দিত হও।

সম্মানিত পিতাজী! আপনাদের সন্তান আপনাদের জন্য সুখের হোক, যে ছিল এক সিংহপুরুষ, শত্রুদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিয়েছে।

আপনি ধৈর্যচ্যুত হবেন না। গর্ববোধ করুন। তার বাকী ভাইদেরকেও গর্ব ও সম্মানের রাজপথে পাঠান।

জিহাদই যদি গর্ব ও সম্মানের রাজপথ না হত, সে পথে যারা চলেছে তারা যদি উত্তম নাই হত তাহলে আল্লাহ আমাদের পূর্বে তাদেরকে নির্বাচন করতেন না, আর আমাদেরকে ফেলে রাখতেন না– আফসোস, অনুতাপ করার জন্য। জানি না, আমাদের পরিণতি কী হবে ?

হে আল্লাহ! আমাদেরকে কল্যাণময় জীবন দান করুন। শহীদী মৃত্যু দান করুন। আপনার পছন্দের বান্দাদের দলে হাশর করুন।

শহীদ আবু যোহায়রার অসিয়ত

অধম বান্দার অসিয়ত আপন কর্তা হানী আহমদ সালেহের উদ্দেশ্যে, আমার অসিয়ত– আপনি তাকওয়া অর্জন করবেন। কেননা তা সবকিছুর মূল। এবং মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসৃত পথে চলবেন। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন।

জিহাদকে আমরা মুক্তির পথরূপে বিশ্বাস করি, আমাদের কর্তব্য জিহাদ ফরয, অথচ মুসলমান এই কর্তব্য থেকে উদাসীন হয়ে আছে। ফলে তারা পথ ভোলা, দিশাহারা, লাঞ্ছিত, অপমানিত। তবে আল্লাহ যাকে দয়া করেছেন সে এ কর্তব্য পালন করছে। আমাদের শত্রুরা আজ সকল ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণ। তাদেরকে দমন করা, তাদের শক্তি ধ্বংস করা– রক্ত ঝড়ানো ছাড়া আর কিছুতেই সম্ভব নয়। এটাই আমাদের লুণ্ঠিত-ইজ্জত সম্মান ফিরিয়ে আনার পথ, এই ত্যাগ ও বিসর্জন ছাড়া আমাদের ভিত্তি মজবুত হবে না। আমাদের অস্তিত্ব টিকে থাকবে না।

অতঃপর আমার সম্মানিত পিতার প্রতি আমার অসিয়ত-

আব্বাজী! আপনি আল্লাহর সকল আদেশ পালন করবেন। সকল নিষেধ থেকে বিরত থাকবেন। আমার ভাই-বোনদের বিষয়ে আল্লাহকে ভয় করবেন। তাদের ব্যাপারে এমন সিদ্ধান্ত যেন না নেন যাতে আল্লাহ নারাজ হোন।

আম্মাজী! আপনি সন্তানদের প্রতি খুব লক্ষ রাখবেন। তাদের যত্ন নিবেন। তাদেরকে উত্তম তরবিয়াত দান করবেন। নিজের ক্ষেত্রে, সন্তানদের ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করবেন। আম্মাজী! আমার থেকে যে ভুল-ত্রুটি ও অসঙ্গতি প্রকাশ পেয়েছে ক্ষমা করে দিবেন।

আমি আপনাদের বলে যাচ্ছি, আল্লাহ তায়ালা আমাকে জিহাদের মাধ্যমে অনেক সম্মান দান করেছেন। এই বরকতপূর্ণ জিহাদে এসেই আমি এই মহাসৌভাগ্য লাভ করেছি যা অন্য কোথাও পাইনি। জিহাদ সমস্ত মুসলিম

উম্মাহর জন্য। কোন জাতি ও কোন অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট নয়। জিহাদের নেই কোন ভৌগোলিক সীমানা।

আম্মা ও আব্বা! যখন আমার শাহাদাতের খবর আপনাদের কাছে পৌছবে তখন আপনারা আনন্দ প্রকাশ করবেন। এবং নিজেদের মহাসৌভাগ্যবান ভাববেন।

আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, জান্নাতে যেন আমাদেরকে একত্র করেন। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম, বান্দার ডাকে সাড়া দেওয়ার তিনিই উপযুক্ত। তিনিই উত্তম অভিভাবক, উত্তম সাহায্যকারী।

শহীদ হুযাইফা আল মাদানী

আজ আমরা এমন কয়েকজন মুজাহিদের জীবন চরিত আলোচনা করব, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সর্বপ্রকার পথ ও পন্থা অবলম্বন করেছেন। সবশেষে আল্লাহ তাদেরকে সবিশেষ যত্ন দ্বারা জিহাদের পথে এনেছেন। আর এখানে এসে তাদের জীবনের গতি প্রকৃতি বদলে গেছে। তাদের জগত সংসার নতুন এক বর্ণ ও সৌন্দর্য লাভ করেছে। তাদের চিন্তা-চেতনায়, ভাবনা ও অভিব্যক্তিতে আমূল এক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

চলুন পাঠক সেই মহান মুজাহিদদের স্মরণে কিছু সময় আমরা তাদের জন্য ইছালে ছাওয়াব করি। হয়ত এ ওছিলায় আল্লাহ আমাদেরও মাকাম বুলন্দ করবেন। তাদের রূহানী ফয়েজে আমাদেরকেও ধন্য করবেন।

আসলে এমন মুজাহিদের সংখ্যা অনেক। শুধু নাম বলে গেলেও পৃথক একটি গ্রন্থের আকার ধারণ করবে। তাই এখানে শুধু নমুনা হিসাবে কয়েকজনের কথা আলোচনা করব। যাদের প্রথম জন হচ্ছে– শহীদ হুযাইফা আল মাদানী।

তার পরিবার হিজরত করে মদীনায় এসেছিল। শুরুর জীবনে আব্দুল হামীদ ছিলো ভবঘুরে একজন সাধারণ যুবক। যখন যেখানে মন চাইত সেখানেই সে ছুটে যেত। প্রবৃত্তির তাড়নায় বিতাড়িত হওয়া ছাড়া তার জীবনের বিশেষ কোন লক্ষ-উদ্দেশ্যই ছিল না। এভাবেই একবার সে পাশ্চাত্যে ঘুরতে গেল। সেখানে গিয়ে পশ্চিমা নারীদের রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে বিবাহও করে ফেলল। সেই সূত্রে ঘন ঘন সেখানে আসা যাওয়া করতে লাগল। পরে অবশ্য ঐ নারীর সঙ্গে তার বিচ্ছেদ হয়ে গেছে এবং আসা-যাওয়াও বন্ধ হয়ে গেছে। এভাবে প্রবৃত্তির গড্ডালিকা প্রবাহে ভাসতে ভাসতে জীবনের একটা পর্যায়ে এসে আসমানের ইশারায় তার কতিপয় পরিবর্তন হয়ে গেল। হঠাৎ একদিন সে আফগানিস্তানের মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশার কথা শুনতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভিতরে ঈমানের নিভুনিভু শিখাগুলো সমহিমায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠল, প্রবৃত্তির নিকষকালো অন্ধকার মুহূর্তের মধ্যে দূর হয়ে গেল। সিংহের হুংকার ছেড়ে সে ছুটে আসল আফগানিস্তানের কান্দাহারে।

কান্দাহারের পথ ছিল চরম ভীতিসংকুল। দুর্গম পাহাড়ী গিরি পথের পাশাপাশি সেখানে রয়েছে বিশাল বিস্তৃত অন্তহীন মরুভূমি, যেখানে আকাশের সূর্য আগুন ঝরায়। আর মরুভূমির বালুরাশি খৈ ফুটায়। এক ফোঁটা বিশ্রামের জন্য সেখানে কোন গাছ নেই। মুমূর্ষ ব্যক্তির গলা ভেজানোর জন্য এক ফোঁটা পানি নেই। আছে শুধু উপরে টহলরত শত্রুর হেলিকপ্টার। আর নিচে উচু নিচু টিলার ভাঁজে ভাঁজে ওত পাতা ট্যাংক-কামান।

এমনই ভয়ংকর মরু-উপত্যকা পাড়ি দিয়ে এগিয়ে চলেছে জিহাদী কাফেলা। পথ চলতে চলতে হুযাইফা তার হৃদয়ে নিভৃত অতিযত্নে লুকিয়ে রাখা শাহাদাতের স্বপ্নে কথা বলতে লাগল। যেন সে চোখের সামনে তা দেখতে পাচ্ছে। এমনকি গত রাতে সে তার শহীদ ভাইকে স্বপ্নে দেখেছে। তিনি তাকে জিহাদ ও শাহাদাতের প্রতি উদ্বুদ্ধ করছেন।

কান্দাহার বিমানবন্দরের কাছাকাছি আট ঘণ্টার দূরত্বে একটা গিরিপথ আছে, পৃথিবীর সবচে ভয়ংকর গিরিপথগুলোর অন্যতম এটি। যে কারণে সবাই এটাকে 'মরণ-গিরি' নামেই চেনে। কান্দাহার বিমানবন্দরে পৌছতে

হলে এই 'মরণ-গিরি' অতিক্রম করতেই হবে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শাহাদাতের তামান্না দিলে তরতাজা করে সবাই ঢুকে পড়লাম ঐ গিরিতে। কিছু দূর যেতেই দুই পাশ থেকে বৃষ্টির মত বুলেট ছুটে আসতে লাগল। দিশেহারা হয়ে সবাই দিগ্বিদিক ছুটাছুটি শুরু করল। অনেক ভাই জায়গায়ই শহীদ হয়ে গেল। কান্দাহারের পথে এই বিভীষিকাময় দীর্ঘ সফরে হুযাইফার সঙ্গী ছিল আবু ছাবেত। ঐ গিরিতে যখন মুজাহিদ বাহিনীর উপরে গুপ্ত হামলা চালানো হল তখনও তারা দুজন এক সঙ্গে ছিল। আবু ছাবেত সেই কঠিন মুহূর্তে স্মৃতিচারণ করেছে এভাবে –

আমরা দুজন এক সঙ্গে হাঁটছিলাম, হঠাৎ আমাদের খুব কাছে একটা বোমার বিস্ফোরণ ঘটল। আর অসংখ্য স্প্রিন্টার আমাদের শরীরে ঢুকে গেল। হুযাইফার আঘাত ছিল মারাত্মক। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে পড়ে থাকতে দেখলাম। আমি কোনমতে জীবন নিয়ে বেঁচে আসার চেষ্টা করলাম। রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত আমার দেহটাকে কিছুটা টেনে হেঁচড়ে, কিছু পথ হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা পথ ক্রোলিং করে এগোতে থাকলাম। অবশেষে এক রাখালকে পেলাম, দুনিয়া আখেরাতে আল্লাহ তার মঙ্গল করুন। বড় ভাল মানুষ ছিল সে, আমাকে দেখামাত্র সে দৌড়ে এসে সাধ্যমত সেবা শুশ্রূষা করল। হঠাৎই মাথার উপর দিয়ে এক বুশ বিমান উড়ে যেতে দেখে তার মাথার পাগড়িটা খুলে আমাকে পরিয়ে দিল। কারণ কান্দহারের কোন বাসিন্দাকে পাগড়ি ছাড়া কল্পনা করাও অসম্ভব। তাই কেউ যেন আমাকে বহিরাগত ভাবতে না পারে সে জন্য রাখাল তার পাগড়ি খুলে আমাকে পরিয়ে দিল। তারপর আমাকে সে তার বাড়িতে মেহমান বানাল, যখন সে জানল আমি আরব, তখন শুধু আমার সম্মানে একটি বকরি জবাই করল, বিষয়টি যত সহজে বললাম, করাটা আসলে এতটা সহজ ছিল না, কারণ এই বকরিগুলোই তাদের জীবন ধারণের একমাত্র সম্বল। তার মত একজন 'বেচারা' রাখাল মুহূর্তের মধ্যে লক্ষটাকার মালিক হতে পারত, শুধু আমাকে বুশ বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে। অথচ সে নিজের সম্বল বিসর্জন দিয়ে আমার ইকরাম করল। আল্লাহর কাছে এর বিনিময় জান্নাত ছাড়া আর কী হতে পারে ?

যাহোক, আমরা যেহেতু কান্দাহার বিমানবন্দরের খুব কাছেই ছিলাম তাই সুনির্দিষ্ট গন্তব্যে যাত্রা করার উদ্দেশ্যে সাথীদের সবাইকে তালাশ করে একত্র করা অপরিহার্য ছিল। তো আমরা সবাই বেরিয়ে পড়লাম। কিছু সাথী তো আমাদের সামনেই শাহাদাত বরণ করেছে। আর কিছু শহীদ ভাইয়ের 'জানাযা' কাছাকাছিই নজরে পড়ল। বাকীদের তালাশে- বিশেষত তিন আরব মুজাহিদ হুযাইফা, আবু তারেক ও আবুল হাসানের সন্ধানে আমরা সর্বশক্তি নিয়োগ করলাম। কারণ আরব মুজাহিদ ভাইয়েরা আমাদের সম্মানিত মেহমান। মনেপ্রাণে কামনা করছিলাম, যেকোন কিছুর বিনিময়ে আল্লাহ যেন তাদেরকে 'বা-হায়াত' রাখেন। কিন্তু তাকদীরে এলাহীর কারিশমা তিনি সব বান্দার সব ইচ্ছা সব সময় একই নিয়মে পূরণ করেন না। কিছু দূর এগুতেই দেখি হুযায়ফার রক্তমাখা দেহ মোবারক পড়ে আছে। তিন দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরও আল্লাহর কী ইচ্ছা তার দেহ মোবারক অক্ষত অপরিবর্তিত রয়েছে। এখানে যেন তার শরীর থেকে তাজা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চেহারায় লেখা আছে এক টুকরো মিষ্টি হাসি।

জিহাদে শরীক হওয়ার মাত্র তিন মাসের মাথায় এভাবেই আল্লাহ তাকে ডেকে নিলেন নিজের কাছে। আর সে চলে গেল আমাদেরকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে। আমাদের হুযাইফার এই ঘটনা স্মরণ করিয়ে দেয় সাহাবী আমর ইবনে ছাবিতের কথা। যার সম্পর্কে হযরত আবু হুরায়রা রা. অনেকটা ঈর্ষার সুরেই বলতেন- আমর জান্নাতে চলে গেল, অথচ সে এক রাকাত নামায পড়েনি, একটা সেজদা পর্যন্ত করেনি। কারণ তিনি ইসলাম গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জিহাদের ময়দানে চলে যান এবং শহীদ হয়ে যান। তো আমাদের ভাই হুযাইফার ঘটনাও ঠিক একই রকম। অন্ধকার এক জীবন পিছনে ফেলে যখনই এসে শরীক হল, জিহাদে আল্লাহ তাকে কবুল করে নিলেন সর্বোচ্চ সম্মান শাহাদাতের জন্য এবং মনোনীত করলেন সর্বোচ্চ পুরস্কার জান্নাতের জন্য। আমীন।

শহীদ আবু তারেক

শহীদ আবু তারেকের সঙ্গে আমার পরিচয় ও সম্পর্ক খুবই সমান্য সময়ের। গাজায় জন্মগ্রহণকারী এই যুবক শৈশব-কৈশর পার করেছে জিদ্দায়। যৌবনের শুরু থেকেই সে নিজের প্রকৃত মাতৃভূমি বাইতুল মাকদিসের প্রতি সীমাহীন ব্যাকুল হয়ে ওঠে এবং শত্রুর হাত থেকে তাকে মুক্ত করার জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি শুরু করে। এভাবে একসময় সে ছুটে আসে জিহাদের ময়দানে। যেদিন তাকে মুজাহিদ কেন্দ্রে প্রথম দেখলাম সেদিনই বুঝতে পেরেছিলাম, সে অন্যদের চেয়ে কিছুটা ব্যতিক্রম। তার চোখের তারায়, চেহারার অভিব্যক্তিতে জিহাদ ও মুজাহিদদের জন্য যে দরদ ও তড়প লক্ষ্য করেছিলাম সত্যিই সেটা বর্তমানে দুর্লভ। তার সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাতই ছিল শেষ সাক্ষাত। কারণ কেন্দ্র থেকে বিদায় নিয়ে প্রথমে সে কান্দাহারে পৌছেছিল। সেখানে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মুজাহিদদের জন্য তহবিল সংগ্রহ করেছে। তারপর সরাসরি রণাঙ্গনে হাযির হয়েছে। আর আল্লাহরও কী ইচ্ছা, জীবনের প্রথম জিহাদেই জনমের শেষ ইচ্ছা পূরণ করে দিয়েছিল। আহ! আমি যদি জানতাম, এটাই তার সঙ্গে আমার শেষ সাক্ষাত, তাহলে আরো কিছু সময় তার সঙ্গে অতিবাহিত করতাম। পরিচয়ের পর যখন সে বিদায় গ্রহণ করতে চেয়েছিল তখন কেন্দ্রের করিডরে দাঁড়িয়ে দশ মিনিট তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলেছিলাম। ইচ্ছে তো ছিল সামনে আবার দেখা হবে। আরো অনেক কথা হবে, কিন্তু তকদীরের ফায়ছালাই চূড়ান্ত। সুতরাং আমার প্রিয় হে আবু তারেক! হয়ত তোমার সঙ্গে আমার শেষ দেখা হয়নি। তবে দুআ করি, জান্নাতে আল্লাহ যেন আমাকে, তোমাকে, আমাদের সবাইকে একত্র করেন। আমীন।

শহীদ আবুল হাসান

আবুল হাসানের মূল নাম হচ্ছে আব্দুল ফাত্তাহ। তার জন্ম সিরিয়ায়। পরবর্তীতে সৌদিতে স্থায়ীভাবে বসবাস করায় সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করেছিল। তার পরিবার জিদ্দায় থাকত। সেখানেই সে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর

পর্যন্ত লেখা-পড়া করেছিল। পরে উচ্চস্তরের পড়াশোনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছিল এবং দুই বছর পড়েছিল। তারপরই মূলত পরিবর্তন দেখা দেয় তার চিন্তা চেতনায় ও আবেগ ভাবনায়। আরামদায়ক শয্যায় শুয়েও সে অনুভব করতে থাকে আফগান ফিলিস্তিনের অসহায় মুসলমানদের দুঃখ-দুর্দশা। প্রাসাদ-অট্টালিকার থাই গ্লাস ভেদ করে তার কানে পৌঁছতে থাকে মজলুম মা-বোনদের আর্তচিৎকার। এতদিন সে ভাবতো, মসজিদের মিম্বার থেকে আওয়াজ তোলা এবং বক্তৃতার মঞ্চ কাঁপিয়ে গর্জন করাই হক প্রকাশের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারল, আল্লাহর যমীনে আল্লাহর কালিমাকে উঁচু করার জন্য জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর কোন বিকল্প নেই। পত্রিকার পাতায় 'কলাম' লিখে হয়ত পকেট পুজা করা যাবে কিন্তু দ্বীনের পতাকা উড্ডীন করা যাবে না।

জীবনকে যখন উপভোগ করার সময়, জীবনের বাগানে যখন বসন্ত বাহার উদ্ভাসিত হওয়ার কথা, সেই স্বপ্নের যৌবনই আবুল হাসানের জীবনে উন্মোচিত করল কষ্ট ও মর্মবেদনার অনন্ত এক দিগন্ত। বাইরে সুখ-শান্তির বাহার, আর ভিতরে জ্বালা-যন্ত্রণার পাহাড়। এভাবে তো আর খুব বেশি দিন চলা যায় না। এক সময় সে এই দ্বৈত জীবনে অতিষ্ঠ হয়ে উঠল এবং বিসমিল্লাহ বলে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল। ঠিক সেই পথ ধরে, যে পথে এগিয়ে চলেছে হুযাইফা ও আবু তারেক।

স্বভাবগতভাবে আবুল হাসান ছিল অত্যন্ত হাসিখুশী একজন যুবক। সবার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলত, সবার কাছে সে সমান প্রিয় ছিল। খুব অল্প সময়ে সে যে কারো হৃদয় জয় করে নিতে পারত। তবে এই স্বভাবের ছেলেরা যেমন চঞ্চল চতুর হয় সে কিন্তু তেমন ছিল না। অত্যন্ত নম্র-ভদ্র, বিনয়ী ও শান্তশিষ্ট ছিল।

যাহোক, আল্লাহর ইচ্ছায় সে একেবারে তরুণ বয়সে আল্লাহর পথে পাড়ি জমায় এবং তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য শাহাদাতের মর্যাদা লাভে ধন্য হয়। আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করুন এবং আমাদেরকে তার পথে পরিচালিত করুন। আমীন।

শহীদ আব্দুল হামীদ

একই যুদ্ধে এমন আরো তিনজন শহীদ হয়েছে যাদের শাহাদাত রীতিমত আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাদের অন্যতম হল আব্দুল হামীদ। তার অন্তরঙ্গ বন্ধু বীর রাহিম যখন তার শাহাদাতের সংবাদ শুনালো, তখন সে এতটাই ভেঙে পড়েছিল যে, মনে হচ্ছিল বন্ধুর সঙ্গে সেই বুঝি দুনিয়ার জীবনকে বিদায় জানাবে। তবে সময়ের প্রলেপ ধীরে ধীরে তার জখম সারাতে সক্ষম হয়েছে। পরবর্তীতে একবার তার সাক্ষাৎ পেলাম, তখন সে তার শহীদ বন্ধু আব্দুল হামীদের স্মৃতিচারণ করল। যার সারগর্ভ বিবরণ নিচে তুলে ধরা হল-

আব্দুল হামীদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক দুই দেহ, এক আত্মা। অবসর পেলে আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে যেতাম। এভাবেই এক গ্রীষ্মের ছুটিতে আমরা অবকাশ যাপনের জন্য চমৎকার প্রাকৃতিক কিছু জায়গা তালাশ করছিলাম। দীর্ঘ কর্মক্লান্তি ও মানসিক অবসাদ দূর করার জন্য আমরা প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত ঘন সবুজ একটি বাগানে গেলাম, যার সবুজ শ্যামলতার কোমল পরশে অগ্নিঝরা সূর্যের প্রতাপ-প্রখরতা ম্লান হয়ে গেছে। কুল কুল রবে বয়ে চলা ঝরনার শীতলতায় বাইরের আগুনে পরিবেশটাও আরামদায়ক হয়ে ওঠেছে।

এমনই আনন্দঘন মুহূর্তে আমাদের হাতে আসল একটি পত্রিকা। যেখানে আফগানিস্তানের জিহাদ এবং মুজাহিদদের বিজয় ও আল্লাহর সাহায্য সম্পর্কে সুবিস্তৃত আলোচনা রয়েছে। সেগুলো পড়ে আমরা খুব আপ্লুত হলাম। জিহাদের জয়বায় উদ্বেলিত হলাম। তারপর খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের আবেগ দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় পরিণত হল। আমরা বেরিয়ে পড়লাম কাবুলের ভিসা নেয়ার জন্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা পাকিস্তানী দূতাবাসে না গিয়ে বুশ দূতাবাসে ঢুকে পড়লাম। অফিসারদের কাছে জানতে চাইলাম, কাবুলে যাওয়ার ভিসা দেয়া যাবে কি না? যাওয়ার উদ্দেশ্য জানতে চাইলে আমরা অকপটে বললাম, জিহাদ করতে যাবো। যাকে বলে 'যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয়'। আমাদের সরলতা অথবা নির্বুদ্ধিতা দেখে তারা পর্যন্ত কানাকানি এবং বিদ্রূপাত্মক হাসাহাসি করল। এতক্ষণে

আমাদের হুঁশ হল। আমরা নিজেদেরকে বাহরাইনের অধিবাসী পরিচয় দিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়লাম। আল্লাহর মেহেরবানী মুজাহিদদের অফিস খুব কাছেই ছিল। সেখানে পৌছার পর তারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে আমাদেরকে গন্তব্যে পাঠানোর ব্যবস্থা করল। তবে সরাসরি কাবুলে পৌছা সম্ভব নয় বলে প্রথমে আমাদেরকে পেশোয়ারে পাঠানো হল। তারপর সেখান থেকে সাখিনা ফ্রন্টে গেলাম। সাখিনার কাছেই লৌগর ফ্রন্ট ছিল। যার প্রধান ছিলেন ডক্টর আলী। আমার দেখা অসাধারণ মানুষদের একজন। তার আচরণ ও উচ্চারণ সকলের ভক্তি-শ্রদ্ধা আদায় করতে সক্ষম। যখন তার মেহমান হলাম, মনেই হল না, আমি অপরিচিত কোন জায়গায় নতুন মানুষের কাছে এসেছি। বরং তাকে পেয়ে আমি যেন আমার ঘনিষ্ট বন্ধুকেই পেয়ে গেলাম। তার পরিবার যেন আমার নিজেরই পরিবার।

এবার শুরু হল ক্যাম্পে আমাদের প্রশিক্ষণ। যে মহান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে সব ছেড়ে এখানে আসা সেই মানযিলে মাকসুদে পৌছার উদ্দেশ্যে শুরু হল কঠোর পরিশ্রম।

ডক্টর অলী আমাদের শারিরীক প্রশিক্ষণের পাশাপাশি মানসিক ও চিন্তানৈতিক যে সাধনায় নিয়োজিত করলেন, তাতে অল্প দিনের মধ্যেই আমার অনুভূতি হল, আধুনিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত বিশাল বিশাল রুশ-বাহিনী বাস্তবে জঞ্জাল জঙ্গলের মত, এগুলো ছাফ করে ফেলা তেমন কোন ব্যাপারই নয়। কারণ আমরা তো হলাম এমন এক বীর পুরুষ জাতি যারা নিজের জীবনের বিনিময়ে উম্মাহর জীবন রক্ষা করে। যারা নিজেদের ইতিহাস রচনা করে, কলমের কালিতে নয় বুকের তাজা রক্ত দিয়ে।

শহীদ আব্দুল্লাহ আল মুহারিব

এখনো মনে পড়ে চুরাশির সেই স্মৃমিয়ম দিনটি, তখন আমি ইসলামাবাদে বসবাস করি। একদিন আমার ঘরে বন্ধুদের সংগে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে পরামর্শ করছিলাম সমাধানের জন্য। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ।

খুলে দেখি আমার প্রিয় আব্দুল্লাহ। উষ্ণ আলিঙ্গন হলো দু জনের। লজ্জায় আমার চেহারা লাল হয়ে গেলো। তাকে ঘরে প্রবেশ করতে বলতে পারছি না, আবার বিদায় জানাতেও পারছি না। আব্দুল্লাহ বুঝতে পরলেন, আমি এখন অনেক ব্যস্ত। তিনি বললেন, আমি শুধু আপনাকে চোখের দেখাটা দেখতে এসেছি, আল্লাহর শোকর দেখা হলো; এখন বিদায় নিতে চাই– এই বলে তিনি পেশাওয়ারের উদ্দেশ্যে রওয়ানা করলেন।

এক সময় আমাদের সম্পর্ক এতটাই গভীর ছিলো যেন আমরা এক দেহ, এক হৃদয়। একই পরিবারের সন্তান এই যুবকদেরকে আমি সন্তানের চেয়ে বেশি মহব্বত করতাম। তারা কাছে থাকলে ভালো লাগতো। তাদের বিচ্ছেদে আমার প্রাণ কাঁদতো। হাঁ এমনই ছিলো আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক। সমবয়সীরা যেন রক্ত সম্পর্কের ভাই। ছোটদের কাছে বড়রা পেত পিতৃত্বের মর্যাদা আর বড়রা ছোটদেরকে সন্তানের মত স্নেহ করতো। এক পলক দেখার জন্য আব্দুল্লাহ ছুটে এসেছে দুইশ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে। আফগান জিহাদে সাড়াদানকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সারির।

তিনি শৈশবের স্বভাব-পবিত্রতা নিয়ে বেড়ে উঠেছেন। স্বচ্ছ হৃদয় এবং উন্নত চরিত্র– এগুলো ছিলো তার অনন্য বৈশিষ্ট্য। শৈশব থেকেই তিনি আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদত বন্দেগীতে অভ্যস্ত ছিলেন। তার জীবন ছিলো একেবারে সাদামাটা, তিনি ছিলেন সেই বেদুইন সাহাবীর জীবন্ত নমুনা, যিনি আবু মুসা আশআরী রা.-এর যবানে একদিন যখন শুনলেন যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, জান্নাত রয়েছে তরবারির ছায়া তলে। তখন তিনি বলে উঠলেন, হে আবু মুসা সত্যি কি আপনি নবী সা.-কে এই হাদীস বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হাঁ, জবাব শুনে তিনি সাথী সঙ্গীদের কাছে গিয়ে সবাইকে সালাম জানালেন, এরপর কোষ থেকে তরবারি হাতে ছুটলেন শত্রু অভিমুখে। এবং যুদ্ধ করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

তার মহানুভবতা এবং জিহাদের প্রতি অন্তহীন পিপাসা ও আগ্রহের একটি উদাহরণ পেশ করি। পাঁচ বছর তিনি জিহাদ করেছেন। মাঝে মাঝে

বাড়িতে যেতেন, অবসরের জন্য নয়, পর্যাপ্ত অর্থ সম্পদ অর্জন করে নতুন উদ্যম উদ্দীপনায় আবার ছুটে আসতেন জিহাদের ময়দানে। নির্ধারিত একটা কাল তিনি মুজাহিদদের মাঝে অবস্থান করতেন এবং তাদের এবং তাদের জন্য দু হাতে খরচ করতেন। আবার ফিরে যেতেন স্বদেশে এবং অর্থ সম্পদে সমৃদ্ধ হয়ে বেড়িয়ে পড়তেন আল্লাহর রাস্তায়।

তিনি একদিন আমাকে বললেন, জিহাদ (এখন) ফরজে আইন– আপনার এই ফতোয়া নিঃসন্দেহে সত্য এবং সেজন্য এখন কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। আপনি কি শায়খ ইবনে তায়মিয়া রহ.এর বক্তব্য দেখেছেন, তিনি কী বলেছেন, তিনি বলেছেন, শত্রুরা যদি মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার উদ্যোগ নেয় তাহলে তার প্রতিরোধ করা প্রত্যেকের উপর ওয়াজিব। স্থানীয় এবং পার্শ্ববর্তী সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। যেমন আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, "যদি তারা দ্বীনের বিষয়ে তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদেরকে সাহায্য করা তোমাদের উপর ওয়াজিব।" এবং পেয়ারা নবী সা. আদেশ করেছেন মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে। চাই সে অর্থের বিনিময়ে জিহাদে শরিক হোক কিংবা নিজ উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শরিক হোক তার ওয়াজিব দায়িত্ব পালন হয়ে যাবে। আর সবাই আপন জান ও নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী অর্থ সম্পদ নিয়ে উপস্থিত হবে আরোহণ করে কিংবা পায়ে হেঁটে। যেমন ঘটেছিল খন্দকযুদ্ধে শত্রুদের অভিযানের পর কারো অনুমতি ছিলো না পিছিয়ে থাকার। সবাই নিজ নিজ সাধ্য অনুযায়ী শরীক হয়েছিলো।

আব্দুল্লাহ তার কথা শেষ করলো, তাকে সমর্থন করলাম। আর মনে মনে বললাম, তিনি হয়ত আমার الدفاع عن أراضى المسلمين أهم فروض الأعيان নামক কিতাবটিতে ইবনে তায়মিয়ার এই ফতোয়া দেখেননি।

আব্দুল্লাহ কান্দাহারকে তার জিহাদী তৎতপরতার জন্যে ভূমি হিসাবে বেছে নিলেন। গোটা আফগানে সবচে ঝুঁকিপূর্ণ এবং কষ্টসাধ্য জিহাদ ছিলো কান্দাহার জিহাদ। সেখানে জিলহজ্ব মাসের একটি যুদ্ধাভিযানের ফলাফল ছিলো খুবই সন্তোষজনক। ধীরে ধীরে শত্রুরা পিছু হটতে লাগলো। আর

মুজাহিদদের বিজয়ী শক্তি বাড়তে লাগলো। ময়দানে তাদের উপর আল্লাহর স্পষ্ট মদদ ও সাহায্য নেমে এসেছিলো।

একদিন যুদ্ধ বড় ভয়ংকর রূপ ধারণ করলো, শুরু হলো গুলাগুলি আর গোলাবারুদের ছুটাছুটি। চারদিকে শুধু গুমগুম আওয়াজ, সেকি ভয়ংকর দৃশ্য। হঠাৎ একটি গোলা এসে আক্রান্ত করলো আব্দুল্লাহকে। তিনি আর কথা বলতে পারলেন না, শুধু আসমানের দিকে শাহাদাত অঙ্গুলি দিয়ে ইশারা করলেন। এরপর তিনি নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন এবং জান্নাতের পাখি হয়ে উড়ে গেল তার পবিত্র আত্মা।

আব্দুল্লাহ শাহাদাতের পর কান্দাহার সীমান্তে দারুল আইতাম সংস্থার পরিচালক শায়খ আকীল আল-আকীল নিম্নোক্ত চিঠিটি আমার কাছে পাঠান। জিলহজ্ব মাসের প্রথম দিকে, আব্দুল্লাহ মুহারিবীর তাজা খুনে সিঞ্চিত হলো কান্দাহারের যমীন।

এই তরুন যুবকের সংগে আমার প্রথম দেখা হয়েছে রমযানের শেষ দিকে রিয়াদে। তখন তিনি জিহাদে শরীক হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। ঈদুল ফিতরের দ্বিতীয় দিনে আমরা এবং আরো কয়েকজন যুবক ইসলামাবাদ বিমানবন্দরে ভিসার কাজ সমাধা করলাম। এবং যথাসময়ে আমাদের সফর শুরু হলো। সেখানে পৌছে তিনি প্রথমেই জাজি অঞ্চলে মুজাহিদদের দলে যোগ দিলেন এবং দীর্ঘ আট মাস জিহাদী কর্মকাণ্ডে লেগে থাকলেন। এরপর সৌদিতে ফিরে এলেন এবং বিবাহ করলেন এবং মদীনা মুনাওয়ায় গিয়ে স্থায়ী আবাস গাড়লেন। তখন থেকে তার সংগে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। পরে জানলাম তিনি মাঝে মাঝেই জিহাদের ময়দানে ছুটে আসতেন মদীনা থেকে অনেক অর্থ সম্পদ নিয়ে। জিহাদের জন্য এবং আহত মুজাহিদদের সেবায় তা ব্যয় করতেন। শুনলাম তিনি নাকি কান্দাহার এলাকায় একটি ছোট হাসপাতাল করেছেন। আমি তাকে দেখার জন্য সবসময় ব্যাকুল থাকতাম এবং মনে মনে তাকে খুঁজতাম। কিন্তু তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। চির বিদায় নিলেন, তাকে দ্বিতীয়বার দেখার সৌভাগ্য আমার হলো না।

তিনি জিহাদে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি সবার খোঁজখবর রাখতেন। একদিন তিনি মুজাহিদ শিবিরে তাদের খোঁজখবর নিচ্ছিলেন। হঠাৎ শত্রু শিবির থেকে একটি গোলা এসে তার গায়ে লাগলো। তিনি সে জায়গায়ই শাহাদাত বরণ করলেন। তার এক সঙ্গী বললো, আক্রান্ত হওয়ার পর তিনি আসমানের দিকে শাহাদাত আঙ্গুলের ইশারা করে ধরে রেখে ছিলেন। এরপর তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। শাহাদাতের পর তার চেহারায় মৃদু হাসির আলোকোজ্জ্বাস বিরাজমান ছিলো। এ ঘটনার কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি প্রবাহিত ঝরনা থেকে গোছল করেছেন। বৃহঃস্পতিবার জুমার রাতে তিনি ইন্তেকাল করলেন।

তার সঙ্গী থেকে একথাগুলো শুনছি আর আমার চোখে তার হাস্যোজ্জ্বল চেহারা ভেসে উঠছে। শাহাদাত লাভের জন্য কেমন পাগলপারা ছিলেন। যারা অন্তর থেকে নিষ্ঠার সঙ্গে তামান্না করে শহীদি মৃত্যুর, আল্লাহ শুধু তাদেরকেই এভাবে শাহাদাত সৌভাগ্যে ধন্য করেন। সুতরাং হে আব্দুল্লাহ ধন্য তুমি, ধন্য তোমার পিতা-মাতা স্ত্রী-সন্তান। আল্লাহ যেন শুহাদার খাতায় তোমার নাম লিখে নেন। আমরাও ধন্য তোমাদের মত শহীদানের সঙ্গী হতে পেরে যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন। একদল শাহাদাত বরণ করেছেন, আরেক দল অপেক্ষায় আছেন। তারা আল্লাহর বিধানে রদবদল করেনি। সাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহী ওয়া আছহাবিহী আজমাইন।

শহীদ সাইয়েদ আহমাদ খলীফা

আহমাদ ছিলেন একক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী। উন্নত মর্যাদায় এবং বংশকৌলীন্যে তিনি ছিলেন অতুলনীয়। তার এক পা অবশ ছিলো। অন্যের কাঁধে ভর দিয়ে এবং অপর হাতে লাঠিতে ভর করে চলতেন। কিন্তু তার গগনচুম্বি হিম্মত ও মনোবল ছিলো। আরো ছিলো ইস্পাতের দৃঢ়তা, পর্বতের অবিচলতা। আফগানবাসীরা সবাই তার পরিবারকে চিনতো। ছোট বড় সবাই তাকে চিনতো। ছোট বড় সবাই তাকে সম্মান করতো। তার বাড়ি ছিলো মেহমান এবং আগন্তুকদের জন্য বিশ্রামাগার। রাত দিন মানুষ আসতো আর যেত। বিভিন্ন তবকার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ। আফগানের প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধান সেনাপতি এবং অন্যান্য নেতৃত্বস্থানীয়রা মদীনায় এলে তার বাড়িতে অবশ্যই আসতেন।

তার বাবা ছিলেন একজন বিদগ্ধ আলিম, মদীনা মুনাওয়ারার নেতৃত্বস্থানীয়দের সঙ্গে তার অনেক সম্পর্ক ছিলো। তিনি চেয়েছিলেন ছেলেকে জানবায মুজাহিদরূপে গড়ে তুলতে এবং জিহাদই যেন হয় তার রাত দিনের ব্যস্ততা এবং মহান লক্ষ্য। ছোট বয়সেই ছেলেকে পাঠালেন আফগানে, সেখানেই তিনি বেড়ে উঠলেন মুজাহিদ পরিবারের সদস্য হয়ে। যারা ১৯৮৭ সালে সবার আগে তারাক্কিদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন।

আহমাদ যখন বালেগ হলেন তখন তাদের একটি মেয়ের সঙ্গে তাকে বিবাহ দিলেন। আফগানী মেয়েকে আরব ছেলের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া ছিলো বড় আশ্চর্যের বিষয়। কারণ, সাধারণত নিজ দেশেই বিবাহের প্রথা চলে আসছে। মেয়েরাও সব সময় চায় বাবা-মায়ের দেশেই থাকতে। কিন্তু আহমাদ যেহেতু ছিলেন উচ্চবংশীয় এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান তাই তারা বিবাহ দিয়েছিল। বৈবাহিক সূত্রে হলেও যেন তারাও এ মর্যাদার কিছুটা ভাগিদার হতে পারে।

আহমাদ পরে উম্মে উসামা নামক একটি মেয়েকে বিবাহ করেন। তার বাড়িও আফগানে, আফগান ভূমির সংঙ্গে তার রয়েছে হৃদয় ও আত্মার

সম্পর্ক। এবং তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন এমন বহু ঘটনা যা আফগান সভ্যতার ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছে।

তার শশুর আবুল হাসান স্বপরিবারে হিজরত করলেন। স্ত্রী সন্তান সঙ্গে নিয়ে। তার জীবনের একাংশ কেটেছে মদীনায় আর রাস্তায়। তারা সবাই প্রথমে এক বাড়িতে আশ্রয় নিলেন। আহমাদের সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হতো। আফগানিস্তান এবং তার জনগণ ও তাদের জীবন কাঠামো এবং তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিহাদের বিকল্প নেই ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তার সাথে আমার দীর্ঘ আলোচনা হতো।

একদিন নাদের শাহের হত্যাকাণ্ডের কাহিনী শুনালেন। সেই মজমায় তিনিও উপস্থিত ছিলেন। আরো শুনালেন, আফগানের সামরিক বেসামরিক সাধারণ জনগণ সবাই তাকে সংবর্ধনা দিতো, যেখানে যেতেন সবাই তাকে সাদরে গ্রহণ করতো। শুধু আফগানবাসীর অন্তরে তার বংশমর্যাদার সুপ্রভাবের কারণে। এবং তার জটিল জটিল সমস্যার সহজ সমাধানের যোগ্যতা, এবং পারস্পরিক মতানৈক্য ও বিবাদ মিটানোর ক্ষেত্রে তার নেতাসুলভ আশ্চর্যজনক দক্ষতা প্রকাশ পেত, যা অন্য কারো পক্ষে সম্ভব হতো না। তার রায় হতো একমাত্র রায়। এবং সবাই সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিতো।

আহমাদ সীমান্ত পাহারার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তার সাথে তার স্ত্রী কন্যা এবং শ্বশুর শ্বাশুরী তারাও যোগ দিয়েছিলেন। রিবাত ফি সাবীলিল্লাহর সওয়াব যেন তাদেরও হয়।

এটাই ছিলো আহমাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা। এরপর দিন গেল মাস গেল তার সাথে যোগাযোগের সুযোগ হলো না, উপায় ছিলো না।

জিলহজ্ব মাসের প্রথম দশ দিন চলছে এখন। এদিনগুলোর আমল আল্লাহর কাছে সবচে' প্রিয়। হঠাৎ একদিন ফজরের পর টেলিফোন বেজে উঠল, রিসিভ করলাম, আহমাদের স্ত্রী বলছেন, আমরা হাসপাতালে; দেখে যান। আমি সঙ্গে সঙ্গে বের হলাম। ওয়ায়েল এবং তার স্ত্রী উম্মে হাসানও সাথে ছিলো। গিয়ে দেখি, আহমাদ বেডে শুয়ে আছেন, রাতের শেষভাগে তিনি শত্রুপক্ষ থেকে আক্রমণের শিকার হয়েছেন এবং গুরুতর আহত হয়েছেন।

এখন ঘুমিয়ে আছেন, বিভিন্ন দোয়ায়ে মাছুরা পড়ে ফুঁক দিলাম। সবাইকে সান্ত্বনা দিয়ে আমি কিছুক্ষণ পর ফিরে এলাম। আর এটাই আমার আহমাদকে বিদায়ের দেখা।

বিকেল ৪টার সময় আমার ছেলে ইব্রাহিম এসে কানে কানে বললো, সাইয়েদ আহমাদ ইন্তেকাল করেছেন। তিনি এখন আবুল হাসানের বাড়িতে। আমি ছুটে গেলাম, সেখানে দেখি, তাকে সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। বেদনায় আমার হৃদয়টা ফেটে যাচ্ছিলো।

বিদায় নিলেন আল্লাহর সিংহ আহমাদ, মাথার পাশে বসে সূরা ইয়াসিন পাঠ করলাম।

আবুল হাসানের সঙ্গে পরামর্শ করলাম, তাকে কোথায় দাফন করা হবে। অনেকে বলল, সাইয়াফের বাড়ি সংলগ্ন মাকবারায়ে শাহাদায় তাকে দাফন করা হোক। ইয়াহয়া সানোয়ার এবং আব্দুল হকের পাশে। তবে সিদ্ধান্ত হলো তাকে জান্নাতুল বাকিতে সাহাবা কেরামের পাশে দাফন করা হবে। আমাদের আশংকা হল তার দেহে কোন পরিবর্তন এসে যায় কিনা, কারণ মদীনায় পৌছতে তো বহু সময়ের প্রয়োজন। বরফেরও কোন ব্যবস্থা নেই। শনিবার রাত গেল। সন্ধ্যায় আমরা তাকে নিয়ে রওয়ানা হলাম বিমান বন্দরে মদীনার উদ্দেশ্যে।

তারবিয়ার দিনের শহীদগণ

(যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ)

এতো কিছুর পরও মুজাহিদদের নিক্ষিপ্ত বোমার ধামাকার ভয়ে ওদের ট্যাংকগুলো আফগানিস্তানের সব সড়কে চলাচল করার সাহসই পায় না। আর ন্যাটো বাহিনীর কোন 'লাল সেনার' পক্ষেই সেখানকার উঁচু-নিচু কোন স্থানে স্বতঃস্ফূর্ত চলাচল সম্ভব হয় না। আর ওদিকে মুজাহিদদের ছোড়া মিসাইলের ভয়ে তো আফগান আকাশে ওদের হেলিকপ্টারের মহড়া রীতিমত নিষিদ্ধ হয়ে গেছে! একের পর এক জয় আমাদের হাতেই আসছিলো। ওহাদ ও নুজুদের অধিকাংশ এলাকায়ই বিজয়ের পতাকা পতপত করে উড়ছিলো। মুজাহিদদের অবস্থা তো এমন ছিলো যে, তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও মনোবল যেন আকাশ ছুঁয়ে যায়। আর অপর দিকে মৃত্যুভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত কাফিরদের মনোবল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়। মুজাহিদদের প্রতিটি তাকবীরের ধ্বনি যেন তাদের কানে মরণধ্বনি হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়। ঠিক এমনটাই বলেছিলো যুদ্ধের ময়দান থেকে ফিরে যাওয়া এক রুশ সৈনিক। টেলিভিশনের পর্দায় এক সাক্ষাৎকারে সে বলে, "আমরা যখন ওদের আল্লাহু আকবার ধ্বনি শুনতাম তখন ভয়ে আমরা কাপড়ে পেশাব করে দিতাম।" প্রতিটি নতুন দিন ছিলো একেকটি জয়ের সূচনা যা আমাদের নিকট ছিলো স্বপ্নের মতো। এ যেন কালামুল্লাহর সেই আয়াতেরই বাস্তব চিত্র যেখানে বলা হয়েছে–

"আল্লাহর পাকড়াও তাদের ঘিরে ধরলো এমন এমন স্থান থেকে যা তারা কল্পনাও করেনি।"

এটা আসলে মুমিনদের জন্য অনেক বড় শিক্ষা, যেমন পূর্ববর্তী আয়াতের পর পরই আল্লাহ বলেছেন– "হে জ্ঞানী সম্প্রদায়, শিক্ষা গ্রহণ কর।"

তাখখার, কুনদুয, ওয়ারদাক, বামিয়ান, গযনী, কান্দাহার, সামানজান– রীতিমত বিধ্বস্ত ভূমিতে পরিণত হয়েছে। আর জালালাবাদ প্রায় বিধ্বস্ত হওয়ার পথে। এত কিছুর পরও আল্লাহর বান্দারা মরণপণ লড়াই করে যাচ্ছিলো। আর তিনি তাঁর বান্দাদের শাহাদাতের মর্যাদা দানে ও তাঁর

নৈকট্য প্রদানে ধন্য করছিলেন। শত্রু-বিমানের নিক্ষিপ্ত বোমাগুলো সেগুলোর ধ্বংসাত্মক শক্তি নিয়ে যেন অপেক্ষায় থাকতো কখন মরণজয়ী মুজাহিদরা একত্রিত হবে আর সেগুলো তাদের উপর পড়ে বিস্ফারিত হবে। এবং প্রায়শ তাই হতো।

আল্লাহর বান্দারা শাহাদাতের যে তামান্না বুকে ধারণ করে জিহাদে আসে তারা তা লাভ করে এবং পৌঁছে যায় মর্যাদার সর্বোচ্চ শিখড়ে যা তারা তাদের রবের নিকট প্রত্যাশা করে। আর সেই সকল ভাগ্যবানদেরই একজন হলো শহীদ প্রকৌশলী আশরাফ।

কবি বলেন–

"হে তারকারাজি! না না, তাঁর আয়ু কম নয়;
বরং ভোর রাতের তারকারা এমনই হয়!!"
"উদিত হলো নতুন চাঁদ তবে পূর্ণ তা হয়নি
কারণ সময় তাকে জোছনা ছড়ানোর অনুমতি দেয়নি!"
"হায়! অসময়েই ঘটে গেলো চন্দ্রগ্রহণ
জোছনা ছড়ানোর আগেই হলো তার অকালে মরণ!"
"সমবয়সীদের থেকে যেন সে ছিটকে পড়লো
আচমকা কোটর ভেদ করে যেন চোখ দুটি বেরিয়ে পড়লো।"

শহীদ প্রকৌশলী আশরাফ

আশরাফের জন্ম ১৯৬১ সালে। জাগতিক শিক্ষার প্রাথমিক সব পর্যায় অতিক্রম করে উচ্চ মাধ্যমিকে ভর্তি হয়েছিলো আলেকজান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে পড়ার জন্য। সে ১৯৮৪ সালে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করে। এরপর ১৯৮৮ সালে ওয়াশিংটনের হার্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রী লাভ করে। এমনকি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীও লাভ করে। কিন্তু.... কিন্তু সে সময় তার কানে ভেসে আসছিলো সন্তানহারা মায়ের বুকফাঁটা আর্তনাদ আর মা-বাবা হারানো এতীমদের জালাময়ী কান্নার হু হু আওয়াজ। ফলে তার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হতে লাগলো আর লাগাতার কাটতে লাগলো বিনীদ্র রজনী। এক পর্যায়ে সে সিদ্ধান্ত নিলো, প্রলোভনকারী দুনিয়ার এসব চাকচিক্য সে ত্যাগ করবে। অবশেষে চিরতরে সে ত্যাগ করলো শয়তানের রাজধানী ওয়াশিংটন ও তার চাকচিক্যময় জীবনধারা এবং লোভনীয় সকল হাতছানি। অতঃপর জিহাদের জন্য বের হয়ে গেলো এমন এক মহান দেশের উদ্দেশ্যে যার মাটি প্রতিনিয়ত জন্ম দেয় হাজারো লাখো মরণজয়ী মর্দে মুমিন-মুজাহিদ। সে বেড়িয়ে পড়লো আফগানিস্তানের পথে। পুরো হৃদয়জুড়ে তার একটাই তামান্না– সেখানকার উঁচু-নিচু পাথুরে পাহাড়ের ধুলোবালি গায়ে মেখে তাদের আপন করে নিবে। আর তরবারির আঘাতে শত্রুদের গর্দান উড়িয়ে মনের জ্বালা মিটাবে। অবশেষে আশরাফ পা রাখলো পবিত্র আফগান মাটিতে। এবং দাখেল হলো মুজাহিদ প্রশিক্ষণ-কেন্দ্রে। আল্লাহ তাকে যেমন সুন্দর শারীরিক গঠন দান করেছিলেন তেমনি দান করেছিলেন উত্তম আখলাকের মহাসম্পদ। হিম্মত ছিলো তার আকাশ-চুম্বী, হৃদয়টাও ছিলো আকাশের মতই প্রশস্ত। সহকর্মীদের সাথেও সর্বদা বিনয়ের সাথে কোমল আচরণ করতো। এক কথায়, সবার মাঝে সে ছিলো মুজাহিদী আদর্শের এক মূর্তিমান প্রতীক।

শাহাদাত

তারবিয়ার দিন অর্থাৎ জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ আমাদের আশরাফ দুনিয়া ত্যাগ করে আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে যায়। মহান আল্লাহর কাছে আমরা

কামনা করি, যেই ডক্টরেট ডিগ্রীর সার্টিফিকেটের মাধ্যমে আশরাফ আমেরিকার নামি-দামী কোম্পানী ও কল-কারখানায় মোটা অংকের বেতনে চাকরি করতে পারতো, তার এমন কোরবানীর বদৌলতে আল্লাহ যেন তার সেই সার্টিফিকেটের পরিবর্তে জান্নাতের শহীদি সার্টিফিকেট তাকে দান করেন। আর তাকে দাখেল করেন এমন জান্নাতে যেই জান্নাতের তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত হয় নহরসমূহ। জান্নাতীরা যেখানে বলতে থাকবে– সুবহানাকা আল্লাহুম্মা। (হে আল্লাহ, তুমি মহান মহীয়ান, তুমি চির পবিত্র।) যেখানে পারস্পারিক অভিবাদনে বলা হবে– সালাম। (শান্তি! শান্তি!) এবং সবশেষে তাদের পবিত্র কণ্ঠে উচ্চারিত হবে– আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন। (সকল প্রশংসা মহান রাব্বুল আলামীনেরই জন্য।)

বাবার চিঠি

আশরাফের পরিবার তার শাহাদাতের সুসংবাদ পাওয়ার পর তার বাবার তরফ থেকে আমাদের কাছে একটি পত্র পৌছে যাতে লেখা ছিলো–

"আমার আশরাফের পুরো জীবনটাই ছিলো ঐ সকল মুসলিম যুবকদের জন্য আদর্শ যারা সর্বদা সত্যনিষ্ঠ ও দ্বীনের প্রতি নিবেদিত প্রাণ। ভদ্রতা ও সভ্যতাই যাদের পরিচয়। আপন প্রতিপালকের উপর পূর্ণ আস্থা ও ভরসার কারণে যারা হাস্যোজ্জ্বল জীবন যাপন করে। দয়া-মায়ায় দিলটা যাদের ভরপুর। অন্তরে যাদের রয়েছে সবার জন্য নিঃস্বার্থ ভালোবাসা। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহারে, ভ্রাতৃত্ববন্ধন রক্ষায় এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার ক্ষেত্রে যারা সদা তৎপর। এককথায়, আল্লাহ তার এই সৃষ্টি জগতকে যেমন সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন আমার আশরাফকেও তেমনই সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছিলেন সর্বপ্রকার চারিত্রিক গুণে। মহান আল্লাহর ইচ্ছায় আশরাফ হিজরী ১৪০৭ সালে হজ্জ আদায় করে। আর সেই বছরটাই ছিলো তার জীবনের শেষ বছর। দ্বীনের পাঁচটি রোকন পূর্ণরূপে পালনের পরপরই আল্লাহ তাকে শাহাদাতের সুমহান মর্যাদা দান করেন। আমরা যারা তার মা-বাবা, ভাইবোন ও আত্মীয়-স্বজন আছি সবাই সবর করছি আর মহান

আল্লাহর কাছে প্রতিদানের আশা করছি এবং তার কাছে তাওফিক প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমাদের এমন নেক আমলের তৌফিক দান করেন যার মাধ্যমে আমরাও সেই সুমহান মর্যাদায় উপনীত হতে পারি, যে মর্যাদা তিনি আমাদের শহীদ সন্তান আশরাফকে দান করেছেন। আর প্রত্যাশা করি আশরাফ যেন আমাদের জন্য আমাদের রবের নিকট সুপারিশ করে তাঁর অবিরত রহমতের ছায়াতলে স্থান দেয়ার জন্য। আল্লাহই তার হুকুম বাস্তবায়ন করেন এবং ইসলাম প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেন আর ধ্বংস করেন কাফিরদের। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারকাতুহু।

শহীদ আশরাফের বাবা

সিদ্দিক আল মিশরী

শহীদ খালেদ মুসতফা আল মিশরী

খালেদ ছিলো আফগানিস্তানের মাটিতে সবচেয়ে কম-বয়সী আরব শহীদ। তার জন্ম ইসলামাবাদে। সেখানেই তার বাবার কাছে লালিত-পালিত হয় সে। তার বাবা বর্শা নিক্ষেপ ও বন্দুক পরিচালনায় অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন।

তিনি আবুধাবি ভিত্তিক একটি পত্রিকায় ইসলামাবাদের সংবাদ-প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করতেন। শত ব্যস্ততার মাঝেও তিনি নিয়মিত পড়াশুনা করতেন। অত্যাধিক পড়াশোনায় কখনো বিরক্ত হতেন না, এমনকি ক্লান্তও হতেন না। বিশেষ করে যখন পড়তেন ঐ সকল মহান ব্যক্তিদের জীবনী– দুনিয়ার চাকচিক্য যাদের ধোঁকা দিতে পারেনি, শত্রুদের রক্তচক্ষু যাদেরকে কখনো দমিয়ে রাখতে পারেনি। যাইহোক, জিহাদে তিনি সীমান্ত প্রহরায় নিযুক্ত ছিলেন। এ কাজেই তার বেশি সময় কেটেছে। সন্তানদের সর্বদা নিজের কাছেই রাখতেন। কষ্টকর জীবনের রূঢ়তা সত্ত্বেও দায়িত্ববোধের সাথে তাদের লালন-পালন করতেন। কখনো তাকে দেখা যেতো ডান হাতের বগলের নিচে বহন করছেন অস্ত্র আর বাঁ হাতে আকড়ে ধরে রেখেছেন তার কোন এক সন্তানকে। এমন সন্তান যার ত্বক এখনো তুলতুলে, কোমল; শরীরের হাড় যার এখনো নরম। তো এভাবেই একটি সরলমনা শিশু বেড়ে উঠে এমন এক ভূমিতে যার ভিতর থেকে উদগত হয় আগ্নেয়গিরি। আর বড় হতে থাকে এমন এক আকাশতলে যে আকাশ প্রতিনিয়ত বর্ষণ করে চলে ধুসর রঙের বোমা বুলেট। কোন সন্দেহ নেই যে এই শিশুটি দুর্ভাগ্য ও দুর্দশার মাঝেই বেড়ে উঠতে থাকবে এবং যন্ত্রণার আগুনে দগ্ধ হতে হতে যুবকে পরিণত হবে।

আমার মনে আছে মুসতফা সাহেব যখন তার ছেলে খালেদকে প্রথম নিয়ে আসেন তখন তার বয়স নয় বছরের বেশি হবে না। এরপর থেকে সাতটি বছর সে এমন পরিবেশেই বড় হয়ে উঠেছিলো।

খালিদের শাহাদাত

তারবিয়ার দিন মুজাহিদদের উপর যে ভয়ানক হামলা চালানো হয়েছিলো কিশোর শহীদ খালেদও তাদের মাঝেই ছিলো এবং আক্রান্ত হয়ে চিরতরে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলো। কবি বলেন-

"কত বকরির বাচ্চার গলায় যে তার মায়ের আগেই ছুরি চালানো হয় তার কি কোন হিসেব আছে!!"

লন্ডন থেকে শাহাদাতের সংবাদ

প্রায় এক মাস পার হয়ে গেলো; কিন্তু শহীদ খালেদের মা তখনো জানেন না যে, তাঁর কলিজার টুকরা খালিদ শহীদ হয়ে গিয়েছে। তার বোন লণ্ডন থেকে তার কাছে ফোন করলো। তখন মাঝরাত। ঘরেও কেউ ছিলো না। ফোনের আওয়াজে তার ঘুম ভাঙলো। তিনি ফোন হাতে নিলেন। অপর প্রান্ত থেকে তার বোন কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে সান্ত্বনার স্বরে বলতে লাগলো- বোন, মৃত্যু তো এমন সেতু যা সবাইকেই পাড়ি দিতে হবে। একথা শুনামাত্রই খালিদের মা হতভম্ব হয়ে পড়লেন। তিনি তার বোনের কথার মর্ম বুঝতে পেরেছেন ঠিকই কিন্তু তার কানকে যেন বিশ্বাস করাতে পারছিলেন না। জোর করেই যেন তিনি শ্বাস-প্রশ্বাস চালু রাখার চেষ্টা করছিলেন। বহু কষ্টে কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে কোন রকমে প্রশ্ন করলেন–'মুসতফা শহীদ হয়ে গিয়েছে!?"

তার বোন উত্তর দিলো।

–"না, তোমার ছেলে খালেদ শহীদ হয়েছে!"

একথা শুনতেই তার পা নিস্তেজ হয়ে গেলো। এবং তিনি মাটিতে গড়িয়ে পড়ে বেহুশ হয়ে গেলেন। প্রায় ২৪ ঘন্টা পর তার চেতনা ফিরে এসেছিলো।

কবি বলেন-

"আমাদের কলিজার টুকরা সন্তানেরা তো আমাদের মাঝেই বেঁচে থাকে!
আমাদের হাত ধরেই তো তারা যমীনের উপর চলাফেরা করে!!"

এভাবেই খালেদ ফুল হয়ে ফোঁটার আগেই কলি অবস্থায় ঝরে গেলো। বয়স হয়েছিলো তার মাত্র ষোল বছর। তার শাহাদাত– বদর যুদ্ধের কিশোর শহীদ উমায়ের বিন আবু ওয়াক্কাসের শাহাদাতকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। চোখের পলকেই গোলাপের এই কলিটিকে ছিড়ে নিয়ে যাওয়া হলো; আমরা তার সুবাসও গ্রহণ করতে পারলাম না!

শহীদ মূসা দামেনী বেলুচেস্তানী

তার জন্মস্থান হলো ইরানের যাহদান এলাকার একটি গ্রামে। মূসা তার বাড়িতেই দ্বীনি শিক্ষা পেয়ে বড় হয়ে উঠে। এছাড়াও সে মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেছিলো। ঘরের দ্বীনি শিক্ষার প্রভাবে সে জাগতিক শিক্ষার ধারা বজায় না রেখে একটি দ্বীনি মাদরাসায় ইলমে দ্বীন ও আদব-আখলাক শিক্ষার জন্য চলে যায়। এটাই তার জন্য সর্বোচ্চ গৌরবের বিষয় ছিলো। কিন্তু সে ভয় করছিলো যে, সরকারের পক্ষ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য তাকে ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আর সরকারি সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের অর্থই হলো– তাকে এমন এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে যোগ দিতে হবে যার না আছে কোন ন্যায় ও সত্যের পতাকা, আর না আছে সত্যনিষ্ঠ উজ্জ্বল কোন লক্ষ্য উদ্দেশ্য। বরং সেখানে গড়ানো আছে ভ্রষ্টতা ও মূর্খতার ঝাণ্ডা। তাই সে আশংকা করছিলো, যদি সে ঐ শয়তানি যুদ্ধে যোগ দেয় আর তার মৃত্যু হয়ে যায়, তাহলে এই মৃত্যু হবে ইরাক ও ইরানের সীমান্তে সবচেয়ে লজ্জাজনক বেহুদা মৃত্যু।

হিজরত

উল্লেখিত কারণে সে পাকিস্তানে হিজরতের সংকল্প করলো যেখানে সে দ্বীন ও শরীয়তের সুমিষ্ট ইলমি সুধা পান করতো, নিজেকে জিহাদের জন্য প্রস্তুত করতে পারবে। তাই সে করাচীতে পৌঁছে দারুল উলুম করাচীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছিলো। করাচিতে অবস্থানকালে সে সময়কে দুইভাগে ভাগ করে নিয়েছিলো। এক ভাগ ছিলো বিশ্ববিখ্যাত দারুল উলুম করাচিতে ইলমের সাধনার জন্য আর অন্য ভাগ ছিলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের প্রশিক্ষণের জন্য। যে জিহাদ হৃদয় ও আত্মাকে দিবে অনাবিল প্রশান্তি ও সুকুন।

কবি বলেন-

"আমার একদিন কাটে অস্ত্রের মাঝে
আর অন্যদিন কাটে ইলমের খোঁজে।"

যুদ্ধের ময়দানে তার শেষ যাত্রা

দরসগাহে বসে দিন কাটানো তার জন্য বড় কষ্টকর হচ্ছিল। কারণ তার মন ছটফট করছিলো বীর সৈনিক মর্দে মু'মিনদের ভূমিতে ছুটে যাওয়ার জন্য। অবশেষে যিলহজ্জ মাসের প্রারম্ভের দশদিন যখন অতিবাহিত হচ্ছিলো তখন সে নিজেকে আর আটকে রাখতে পারলো না। শাহাদাতের তামান্না নিয়ে দশজন সহপাঠির সাথে বেড়িয়ে পড়লো আফগানিস্তানের পথে। এভাবেই চুপিসারে, সন্তর্পণে তারা নিজেদেরকে নিরাপত্তা-প্রাচীর-বেষ্টিত ইলমের নূরানী পরিবেশ থেকে বের করে ছুঁড়ে দিলো মৃতপুরের ভয়াল সাগরে।

এভাবেই বেড়িয়ে পরলো রক্তিম শুভ্র মাছুম চেহারার বিনয়-নম্র যুবক মূসা। এমন সৌভাগ্যবান যুবকের কথা খুব কমই শোনা যায়। সে সবসময় নিজের আয়েব দোষ ত্রুটি ও দুর্বলতার কথাই বলতো। (সুসংবাদ তার জন্য যার নিজের দোষ-ত্রুটি আলোচনার আধিক্য অন্যের দোষ-ত্রুটি আলোচনা থেকে তাকে বিরত রাখে।) ভ্রূ কুঁচকাতে বা কাউকে ব্যঙ্গ করতে তাকে কখনো

দেখা যায়নি। মুখে তার সর্বদা মিষ্টি হাসি লেগেই থাকতো। হৃদয় তার এতটাই প্রশস্ত ছিলো যে তা পুরো একটি জনগোষ্ঠির ব্যথা-বেদনা কিংবা বড় একটি জনপদের আশা-আকাঙ্খা ধারণ করতে পারবে।

শাহাদাত

জিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ তারবিয়ার দিন তার দুনিয়ার জীবনের অবসান ঘটলো। আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেলো পরম সত্তার সান্নিধ্যে। তার শাহাদাতের সংবাদটি ছিলো মনকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দেয়ার মত এক হতভম্বকারী বিষয় যা সবাইকে নীরব করে দিয়েছিলো এবং সবার হৃদয়কে দগ্ধ করে দিয়েছিলো। মুসার এই শহিদী মৃত্যু যেন তার সহপাঠি, উসতায ও সমস্ত বিদগ্ধ মানুষকে এই সত্য বার্তা দিয়ে গেলো যে, প্রকৃত ও হাকীকী জীবন হলো ওই ব্যক্তির জীবন যে মানব ও মানবতার কল্যাণে ঘোড়ার পিঠে দাপিয়ে জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। যেখান থেকেই কানে আসে মানবতার করুণ চিৎকার ও হাহাকার, সেখানেই সে ছুটে যায় নির্ভয়ে, নির্ভীক চিত্তে, মৃত্যুকে আলিঙ্গনের পরম প্রত্যাশায়।

শহীদ আব্দুল্লাহ আব্দুল ওয়ালী আয যাহাব (আবু ওমর ইয়ামানী)

আমার দেখা অনুযায়ী ইয়ামানীদের স্বভাব আফগানীদের স্বভাবের সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয় দেশের মানুষের স্বভাবচরিত্রের মত তাদের মাটির প্রকৃতিতেও রয়েছে যথেষ্ট মিল। শরীয়তের বিষয়াদি জানার জন্য ওলামায়ে কেরামের নিকট গমন, সামরিক ইউনিফর্ম পরে বন্দুক কাঁধে চলতে থাকা, যুবকদের পাহাড়-আরোহন-প্রতিযোগীতা এ সকল বিষয়ে যথেষ্ট মিল রয়েছে আফগান ও ইয়েমেনবাসীদের মাঝে।

কবি বলেন-

"যুবকদের যৌবনশক্তি আর তরুণদের তারুণ্যদীপ্ত হিম্মত অবসাদ ও ক্লান্তি নামের কিছু চেনে না।"

ইয়ামানবাসীদের আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্মানবোধ অনেক উঁচু আর অন্তরে তাদের যে দ্বীনি গায়রত রয়েছে তা সম্পূর্ণ অকৃত্রিম। আফগানিদের অবস্থাও ঠিক এমনই। তো ইয়ামানের পবিত্র মাটি ছেড়ে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জতের ডাকে সাড়া দিয়ে যারা আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে গিয়েছিলো আব্দুল্লাহ তাদেরই একজন। তারা সকলেই আল্লাহর এই আয়াতের ব্যাপারে ভয় করছিলো যে আয়াতে আল্লাহ বলেছেন–

"আপনি বলুন যদি তোমাদের মা-বাবা, সন্তানাদি, ভাই-বোন, স্ত্রীগণ, আত্মীয়-স্বজন এবং ঐ সম্পদ যা তোমরা কামাই করেছো এবং ঐ ব্যবসা যার ক্ষতি হওয়ার আশংকা করছো এবং তোমাদের প্রিয় ঘর-বাড়িগুলো তোমাদের নিকট অধিক প্রিয় হয়ে থাকে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা থেকে তাহলে তোমরা আল্লাহর আযাবের অপেক্ষায় থাকো। আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হিদায়েত দেন না।"

তো এই আয়াতকে সামনে রেখে ৪০ বছর বয়সে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বেড়িয়ে পড়েছিলো আব্দুল্লাহ। ঘরে ছিলো তার বৃদ্ধা মা যার একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ ছিলো না। এর উপর আবার নিদ্রাহীনতা, বুকফাটা কান্না আর বিচ্ছেদ বেদনার অস্থিরতা।

আব্দুল্লাহ ছনআ' এলাকার বাসিন্দা ছিলো। সে জোয়ান ছিলো। নিরালায় নির্জনে থাকতে পছন্দ করতো। লোক সমাগমে তাকে তেমন দেখা যেত না। অধিকাংশ সময় দেখা যেতো ইলমের হালকায় কিংবা কোরআন হিফযের দরসে। এছাড়া দ্বীনি সভা ও বক্তৃতার মজলিসেও নিয়মিত যাতায়াত করতো। তার এমন ব্যক্তিত্বের কারণে মানুষের হৃদয়ে তার মর্যাদা ও সম্মান ছিলো অনেক। আব্দুল্লাহ যখন সামরিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যোগ দিলো তখন সে যেন নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলো। তার সামনে যেন খুলে যেতে লাগলো জীবন ও জগতের নিগূঢ়তম রহস্যসমূহ। যা

শুধুমাত্র একজন সাহেবে দিল ও হৃদয়বান ব্যক্তির সামনেই খুলে থাকে। সে যেন নবীজীর এই হাদিসের আমলি তাফসীরের সন্ধান পেয়ে গেলো– "তোমাদের কর্তব্য হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে বের হওয়া। কেননা জিহাদ হলো জান্নাতের দরজাসমূহের মধ্যে একটি দরজা। এর মাধ্যমে আল্লাহ সমস্ত দুশ্চিন্তা ও দুঃখ-দুর্দশা দূর করেন।"

শাহাদাত

তারবিয়ার দিন আব্দুল্লাহ পরম প্রিয় সত্তার সান্নিধ্য লাভ করে। আর ছনআ'য় রেখে যায় তার সকল স্মৃতি। ছনআ'র আধার রাত আর তারাভরা আকাশ যেন এখনো তার বিচ্ছেদ বেদনায় বলে উঠে–

"আমি যখন কারো সম্পর্কে কিছু বলি তখন
তোমার সম্পর্কেই হয় আমার প্রথম উক্তি–
আর যখন নীরব থাকি তখনও হৃদয়ে থাকে
আমার শুধু তোমারই অভিব্যক্তি।"

তোমায় অভিনন্দন! হে আব্দুল্লাহ, জীবনের এমন সুন্দর সমাপ্তির জন্য। মহান দয়ালু আল্লাহর নিকট আমাদের আরজি তিনি যেন তোমার শহীদি মৃত্যু কবূল করেন এবং আমাদেরকেও তোমার সাথে শামিল করে নেন। আমীন!

শহীদ তাইসির ইবনে সালিম আর রাবিহ

সে অধিকাংশ সময়ই নীরব থাকতো। নিরবতাই হিকমত। নিরবতাই প্রজ্ঞার পরিচায়ক। সে অত্যধিক যিকির করতো। এবং এটাই একজন আদর্শ মুজাহিদের সিফাত। আল্লাহ তা'আলা বলেন-

"হে ঈমানদারেরা, যখন তোমরা কোন সৈন্যবাহিনীর সম্মুখীন হবে তখন অবিচল থাকবে এবং বেশি বেশি আল্লাহর যিকির করবে যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো।"

আর শাহাদাত! সে তো ছিলো তার হৃদয়ের একমাত্র তামান্না। যে তামান্না প্রতিনিয়ত তার মুখ থেকে শব্দের ফুল হয়ে ফুটতে থাকতো। তার বাবা আমার সাথে যোগাযোগ করে তার সম্পর্কে জানতে চাইলে আমি তাকে তাইসিরের শাহাদাতের সুসংবাদ দেই এবং দোয়া করি আল্লাহ যেন তাইসিরকে তার সুপারিশকারী হিসেবে কবুল করেন। তাকে বললাম- "আপনার ছেলের মত সন্তানদেরকে নিয়ে উম্মত গর্ব করে এবং লাখো ঘুমন্ত প্রাণ তাদের দেখে জেগে উঠে।

সত্য ইলহাম

জুমআর দিন শাহাদাতের কয়েক ঘণ্টা আগে সে বলেছিলো, "তামান্না হয় একটা উড়ন্ত বোমা এসে আমার গায়ে পড়ুক আর আমি শহীদ হয়ে যাই।" আল্লাহর কী কুদরত! তিনি তাইসিরের তামান্নাকে সত্য করে দেখিয়েছেন। জিহাদের ময়দানে তার মৌলিক একটি কাজ ছিলো- মুজাহিদদের ঈমানী তরবিয়ত করা ও তাদের রুহানী খোরাক যোগানো। কারণ সে ছিলো একজন আদর্শ অনুসরণীয় আল্লাহওয়ালা সৈনিক। তার অনুপস্থিতি মাঝে মাঝে মুজাহিদদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলতো।

সালাম, হাজারো সালাম হে মমতাময়ী মা! আন্তরিক অভিনন্দন জানাই আপনাকে আপনার সন্তানের শাহাদাত উপলক্ষে!!!

(যবীহুল্লাহ) শহীদ আবু হামেদ (মারওয়ান)

শহীদ আবু হামেদের মূল নাম মুস্তফা। উপনাম আবু হামেদ। আফগান যুদ্ধে শরীক হওয়ার পর শায়েখ মারওয়ানের বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে মারওয়ান লকব গ্রহণ করেছিল। শহীদ হওয়ার আগে সে বলখ অঞ্চলের অভিযানে শরীক হয়েছিল। ওখানে গিয়ে যখন সে জানতে পারল, এই সমগ্র অঞ্চলে জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ'র বীজ বাপন করেছেন "যবীহুল্লাহ"। তখন থেকে সে নিজেকে যবীহুল্লাহ বলা শুরু করল।

আবু হামেদের জন্ম সিরিয়ার ইদলিব শহরে। যে সিরিয়া সম্পর্কে আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন– "শামের যমীনে আল্লাহর ফেরেশতারা নূরের ডানা বিস্তার করে।"

এই বরকতময় ভূমিতেই কেটেছে আবু হামেদের শৈশব-কৈশোর। যদিও তখন নাছিরিয়া গোষ্ঠীর অপতৎপরতায় মুসলমানদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও মূল্যবোধ একেবারে কোণঠাসা হয়ে পড়েছিল, কিন্তু আবু হামেদের পরিবার ছিল অত্যন্ত ধার্মিক। ধর্মীয় সকল বিষয়ে তারা ছিল সুদৃঢ় ও কঠোর।

ছোটবেলা থেকেই আবু হামেদ শুনে আসছে মুসলমানদের উপর জালেমদের বর্বর নির্যাতন-নিপীড়নের কথা। সিরিয়ার মত একটি মুসলিম রাষ্ট্রের মহাসড়কে দিনের আলোয় সবার সামনে মুসলিম মা-বোনদের ইজ্জত-আবরু লুণ্ঠনের নিদারুণ কাহিনী। ইহুদী-খৃস্টান সন্ত্রাসী কর্তৃক মসজিদে নামাজরত মুসল্লীদের উপর কাপুরুষোচিত জঘন্যতম হামলার ঘটনা। ছোটবেলায় শোনা ঘটনার কিছু নমুনা যুবক বয়সে তাকে প্রত্যক্ষও করতে হয়েছে। এমনকি টগবগে যৌবনের উন্মাদনাচ্ছল রক্ত নিজের শিরায় ধারণ করা সত্ত্বেও এসব কিছু তাকে নীরবে হজমও করতে হয়েছে। কিন্তু এভাবে আর কত দিন? আবু হামেদের মত আরো বহু যুবক একই জিজ্ঞাসার সামনে স্থির, স্থবির। কিছু তো একটা করতেই হবে। কোন একটা উপায় তো বের করতেই হবে।

হঠাৎ একদিন আবু হামেদ জানতে পারল– এক আরব সিংহ পুরুষ, মহান বীরযোদ্ধা মারওয়ান হাদীদ সম্পর্কে। দেশ ও জাতিকে সর্বোপরি গোটা

মুসলিম উম্মাহকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করার জন্য, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার এবং যিল্লতি ও অপদস্থতার জীবন থেকে উদ্ধার করার জন্য যিনি নিজের জীবন ও যৌবনকে আল্লাহর পথে কোরবান করে দিয়েছেন। এমনকি ১৯৬৪ সনে জালেমদের বিরুদ্ধে কঠোর আন্দোলনের কারণে তাকে গ্রেফতারও করা হয়। হুমকি-ধমকি কোনকিছুতে কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে ফাঁসির আদেশ জারি করা হয়। অবশ্য পরবর্তীতে বিশেষ বিবেচনায় তার ফাঁসি মওকুফও করা হয়। তবে তাকে বশে আনার জন্য লোভ-প্রলোভন ও আপোষ-তোষামোদের নতুন কৌশল বেছে নেয়া হয়। তারপরও কোন রকম পরিবর্তন না দেখায় তাকে জেলে পাঠানো হয়। এই মর্দে মুজাহিদের জীবনের শেষ দিনগুলো এভাবেই জেলের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে কেটে যায়।

যাহোক, আবু হামেদ নিজের নামের সঙ্গে মারওয়ান উপাধি যোগ করল এবং মুজাহিদ কমাণ্ডার আব্দুস সাত্তারের নেতৃত্বাধীন 'মারওয়ান' ফ্রন্টে যোগ দিল। উপরোল্লেখিত মর্দে মুজাহিদ মারওয়ানের বীরত্বগাঁথাকে স্মরণীয় করতেই "মারওয়ান ফ্রন্ট" এর নামকরণ করা হয়েছিল। এই ফ্রন্টের কাজ ছিল দুর্ধর্ষ অভিযানগুলো পরিচালনা করা। আবু হামেদ এখানে যোগ দেয়ার পর বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও আঞ্জাম দিয়েছিল। এরই মধ্যে হঠাৎ একদিন সতেরজন সঙ্গীসহ শত্রুদের হাতে বন্দী হয়ে গেল। রুশ বাহিনী তাদের সবাইকে ধরে নিয়ে গিয়ে ফাঁসির আদেশ জারি করল। মুজাহিদদের এই ছোট্ট বাহিনী আল্লাহর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে লাগল। কিন্তু কুদরতের কারিশমা, আবু হামেদের ভাগ্যে কী লেখা ছিল তখনো সেটা কারোই জানা ছিল না। রুশ বাহিনীর কারাগার থেকে কেউ পালিয়ে আসবে– এটা বাস্তবে তো বটেই, এমনকি স্বপ্নেও কল্পনা করার সাহস ছিল না কারো। কিন্তু আল্লাহ যখন কোন ফায়সালা করেন তখন তা রোধ করার কোন উপায় থাকে না। আবু হামেদের মৃত্যুর জন্য আল্লাহ যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন ঐ সময় আসতে তখনো অনেক বাকী ছিল। আর আল্লাহর ফায়সালা হচ্ছে, "যখন তাদের মৃত্যু হাযির হয় তখন তারা– না একমুহূর্ত পিছে যেতে পারে, না একমুহূর্ত আগে যেতে পারে।"

যাহোক, আবু হামেদের এক সাথী একদিন হাম্মামের[১] ছোট (নিষ্কাশন) জানালা দিয়ে পুরোনো জং ধরা একটা করাত দেখতে পেল। ঐ করাত দিয়ে প্রতিদিন তারা একটু একটু করে তাদের ঘরের জানালা কাটতে থাকল। অবশেষে একদিন গভীর রাতে তারা সবাই ঐ জানালা দিয়ে লাফিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসল এবং অতি গোপনে একে একে তিনটা চত্বর পার হয়ে জেলখানার বিশাল দেয়ালও টপকাল।

এবার তারা এক অস্ত্রধারী প্রহরীর সামনে পড়ে গেল। কিন্তু ভয়ে দিশা না হারিয়ে সদর্পে তার সামনে দাঁড়াল। প্রহরী পরিচয় জানতে চাইলে তারা উত্তর দিল, আমরা ইখওয়ানুল মুসলিমীন। আর "ইখওয়ানু মুসলিমীন" (বা মুসলিম ব্রাদারহুড) সংগঠনটি শত্রুপক্ষের জন্য এমনই ভয়ংকর একটি নাম যা শুনলে তাদের শরীরের রক্ত পানি হয়ে যেত। গলা শুকিয়ে হাত-পা অবশ হয়ে যেত। কেউ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হত, কেউ বা সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে যেত। এখানেও তার ব্যতিক্রম হল না। প্রহরী "ইখওয়ান" শব্দটা শুনেই ভয়ে থরথর করে কাঁপা শুরু করল। আর হাতজোর করে তাদের কাছে এই বলে প্রাণ ভিক্ষা চাইল যে, আমার ছোট ছোট বাচ্চা আছে, ওদেরকে এতীম করো না। দয়া করে আমাকে ছেড়ে দাও। তখন তারা প্রহরীর বন্দুক কেড়ে নিয়ে দ্রুত সরে পড়ল।

সীমানা-প্রাচীর টপকে যখন তারা রাস্তায় নামল তখন এক পুলিশ অফিসার তাদেরকে থামিয়ে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। তারা একই উত্তর দিল– আমরা "ইখওয়ানুল মুসলিমীন।" উত্তর শুনে অফিসারের পিলে চমকে গেল। তাদের পায়ে পড়ে জীবন ভিক্ষা চাইল। তারা বলল, ঠিক আছে, তবে তোমার গাড়ি দিয়ে আমাদেরকে গন্তব্যে পৌছে দিতে হবে। প্রাণের ভয়ে সে রাজি হয়ে তৎক্ষণাৎ তাদেরকে গাড়িতে তুলে নিল। তবে সতর্কতাবশতঃ তাদেরই একজন গাড়ি চালাল এবং আল্লাহর খাছ মেহেরবানিতে অবশেষে তারা সীমান্তে পৌছে গেল। গাড়িসহ পুলিশকে এপারে ফেলে তারা সীমান্ত অতিক্রম করল। ওপারে গিয়েই তারা হেলিকপ্টারের আওয়াজ শুনতে পেল। পিছন ফিরে দেখল তাদেরকে ধরার জন্য কারা-কর্তৃপক্ষ হেলিকপ্টার

---

[১]. হাম্মাম অর্থ : গোসলখানা, বাথরুম।

নিয়ে সীমান্তে এসে পৌঁছেছে। আর কয়েক মুহূর্ত বিলম্ব হলেই তারা ধরা পড়ে যেত।

এরপর আবু হামেদ পাকিস্তানে গিয়ে এক বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হল। দীর্ঘ কয়েক বছর পর পাকিস্তানে তার সঙ্গে আমার দেখা হল। আমি অবশ্য ওকে চিনতে পারিনি। কারণ ওরা যে এমন অলৌকিকভাবে বেঁচে গেছে। সেটা তো আমরা কল্পনাও করিনি। যাহোক, আবু হামেদ আমাকে দেখে দৌড়ে কাছে আসল এবং হাসতে হাসতে সালাম-সৌজন্য করল। পরিচয় জিজ্ঞাসা করার পর ও সব ঘটনা খুলে বলল। সৌজন্য বিনিময় শেষে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনাকে আপনি আমার জন্য কেমন মনে করছেন? উত্তরে আমি বললাম-

"গৌরব ও মর্যাদার সর্বোন্নত জীবন থেকে বেরিয়ে এসে খুবই সাদামাটা ও নিম্নমানের জীবন-ধারণ করা অন্তত তোমার জন্য সাজে না। জিহাদের জীবনে তুমি ছিলে বিশাল একটি জাতি ও জনগোষ্ঠীর কর্ণধার। আর এখন তুমি যাপন করছো নিস্তরঙ্গ-স্থবির এক জীবন। কোরআনে আল্লাহ যাদেরকে তিরস্কার করে বলেছেন- "(জিহাদ থেকে) পশ্চাদপদ"– তো প্রবাহমান তরঙ্গময় জীবন-নদীতে বয়ে চলা কিশতির একজন কাপ্তান– যার হাতে বহু মানুষের জীবনের নিয়ন্ত্রণ সে কীভাবে হাল ছেড়ে সংগ্রামী জীবন ত্যাগ করে স্থূল ও স্থবির জীবন নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারে– যে জীবনের সামনে মহৎ কোন লক্ষ্য নেই, খেয়ে পরে কোন মত কবরে যাওয়া ছাড়া আর কোন চিন্তা নেই!!"

আমার কথা শেষ হতেই সে বলে উঠল– তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে এক্ষুণি আমি ফিরে যাবো জিহাদের ময়দানে। হুবহু একই ঘটনা ঘটল আবু হামেদের আরেক সাথী আবু উছায়েদ এর সঙ্গেও। তারা দু'জনই আবার রণাঙ্গনে ফিরে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করল। সিদ্ধান্ত হল তারা বল্‌খ অঞ্চলের মাজার শরীফের অভিযানে অংশগ্রহণ করবে। সে অনুযায়ী বলখের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা ইউনিট তাদেরকে নির্দিষ্ট স্থান থেকে গাড়িতে তুলে নিবে। বলখের রাস্তা যেমন ভয়ংকর তেমনই সুদীর্ঘ। পায়ে হেঁটে পুরো এক মাসের রাস্তা। যার বিশাল একটা অংশ বরফে ঢাকা। এই বন্ধুর পথে বহু বীরযোদ্ধা

প্রাণ হারিয়েছে। বহু টগবগে যুবক হোঁচট খেয়ে চলতে গিয়ে হারিয়ে গেছে চিরদিনের জন্য। তবে আবু হামেদ নিরাপদেই বলখের মাজার শরীফে পৌঁছে গেল। ওখানে যাওয়ার পর থেকে সে শহীদ যবীহুল্লাহর কথা খুব বেশী বেশী শুনতে থাকল। সবাই তাকে বলখের সিংহ বলে থাকে। কারণ বলখের এই বিশাল অঞ্চলে যবীহুল্লাহ-ই সর্বপ্রথম জিহাদের ডাক দিয়েছিল এবং শক্তিশালী মুজাহিদ বাহিনী গঠন করে মজলুম মুসলমানদের মুক্তির জন্য সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছিল। যবীহুল্লাহর এমন বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা আবু হামেদকে অতি-উৎসাহী ও সীমাহীন অনুপ্রাণিত করল। এক সময় সে "যবীহুল্লাহ" কে নিজের লকব বানিয়ে নিল।

আবু হামেদ শাহাদাতের প্রতি আগের চেয়ে অনেক বেশী উদগ্রীব হল। তবে শহীদ হওয়ার আগে ছদ্মবেশী মুজাহিদ মুনাফেক আবু আব্দুল্লাহকে– যে তাকে শত্রুর হাতে তুলে দিয়েছিল– কতল করার দৃঢ় ইচ্ছা ছিল। যাতে অন্য মুজাহিদরা তার দ্বারা প্রতারিত না হয়।

আবু হামেদের নিশানা ছিল খুবই নিখুঁত। বন্দুক-কামান সে ভালই চালাতে পারত। বিশেষ করে বিমান বিধ্বংসী কামান চালনায় তার দক্ষতা ছিল নজরকাড়া। মাজার শরীফে পৌঁছে সে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে গেল, যেখানে বিমান বিধ্বংসী কামান রাখা ছিল। সে খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক আফগান যোদ্ধাকে কামান দাগানো শিখিয়েছিল। এমনকি অল্প কয়দিনের ব্যবধানে শত্রুদের দুইটা অত্যাধুনিক বিমানও বিধ্বস্ত করেছিল। তদুপরি সে অত্যন্ত দুঃসাহসী ও তড়িৎগতিসম্পন্ন ছিল। একবার সে শত্রুর বিমান ঘাঁটিতে গিয়ে মাইন পুঁতে রেখে এসেছিল। কিছুক্ষণ পর একটা ট্যাংক বহর ওখান দিয়ে অতিক্রম করার সময় বিকট শব্দে বিস্ফোরণ ঘটে এবং বিশাল একটা ট্যাংক পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে যায়।

অবশেষে হাযির হল ১৪০৭ হিজরীর ১৬ই মুহররম মোতাবেক ১৯৮৬ এর ১২ই সেপ্টেম্বর– যেদিন আল্লাহ তার শাহাদাতের ফায়সালা লিখে রেখেছিলেন। শত্রু বাহিনীর ছোঁড়া রকেট লাঞ্চার এসে সোজা আঘাত হানল আবু হামেদের বুকে। সঙ্গে সঙ্গে ওখানেই ঐ বিশাল উঁচু পাহাড়ের চূড়ার উপর ঢলে পড়ল আবু হামেদের পবিত্র দেহ। পাহাড়ের চূড়াতেই রচিত হল

তার শেষ শয্যা। এখন থেকে ওখানেই সে আরাম করবে। কেউ তাকে জাগাবে না। তাকেও আর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে শত্রুর মোকাবেলা করতে হবে না। তার চারপাশে এখন আনাগোনা হবে জান্নাতী হুর গেলমানের। আল্লাহ যেন এমনই করেন– আমীন।

জান্নাতী হুরের সাক্ষাতে জান্নাতী যুবক

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক রহ. তার বিখ্যাত কিতাব "আল-জিহাদ"-এ বর্ণনা করেছেন, এক যুবক শাহাদাতের তামান্নায় দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করছিল। কিন্তু তার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ না হওয়ায় সে ভাবল, ঘরে ফিরে গিয়ে বিবাহ করব। তারপর আবার ফিরে আসব। ভাবতে ভাবতে সে তাঁবুতে ঘুমিয়ে পড়ল। যোহরের সময় যখন তাকে ঘুম থেকে জাগানো হল তখন সে এমনভাবে কাঁদতে লাগল যেন তার বড় ধরনের কিছু একটা ঘটেছে। সবাইকে চিন্তিত দেখে যুবক বলল, না.... আমার কিছু হয়নি ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখেছি। তাই কিছুটা অস্বাভাবিক বোধ করছি।

আমি যখন ঘুমিয়ে পড়লাম তখন এক লোক এসে বলল, চলো তোমাকে তোমার অপূর্ব সুন্দরী প্রেয়সীর কাছে নিযে যাই যাকে বলা হয় 'আইনা'। আমি তার সঙ্গে রওয়ানা হলাম। অত্যন্ত আলোকোজ্জ্বল এক ভূমি অতিক্রম করে একটি বাগানের কাছে আসলাম। এত সুন্দর বাগান জীবনে আমি কখনো দেখিনি। বাগানের মধ্যে দশজন সুন্দরী রূপসীকে দেখলাম, এত সুন্দর রূপবতী জীবনে কখনো দেখিনি। মনে মনে বলছিলাম, হয়ত এদেরই একজন হবে আমার স্ত্রী। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের মধ্যে কি আইনা আছে? তারা বলল, না... আমরা আইনার সেবিকা। আমার সঙ্গী আমাকে নিয়ে সামনে চলতে থাকল। এবার আমরা আরেকটি বাগানের কাছে পৌছলাম, যা পূর্বেরটার চেয়ে কয়েক গুণ বেশী সুন্দর এবং ভিতরে বিশজন অপ্সরা রমণীকে দেখলাম, যারা আগের দশজনের চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী। মনে মনে কামনা করলাম এদেরই একজন যেন হয় আমার স্ত্রী। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের মধ্যে আইনা কে? তারা উত্তর দিল,

আমরা তার খাদেমা। এভাবে পরবর্তী বাগানে ত্রিশজন সুন্দরী রমণীর সাক্ষাত পেলাম, যারা পূর্বের সবগুলোর চেয়ে অনেক বেশী সুন্দরী ছিল। সবশেষে পৌছলাম বর্ণনাতীত সুন্দর একটা গম্বুজের কাছে, যা লাল ইয়াকুত পাথর দ্বারা তৈরি। সবকিছু সেখানে অদৃশ্য আলোয় আলোকিত হয়েছিল। আমার সঙ্গী বলল, ভিতরে প্রবেশ করো। ভিতরে গিয়ে আমি তো হতভম্ব, সৌন্দর্যের এমন কল্পনাতীত প্রকাশও ঘটতে পারে! এই হল সেই আইনা, আমার স্ত্রী বলে যার কাছে আমাকে আনা হয়েছে। তার সবকিছু থেকেই সৌন্দর্যের দ্যুতি ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। তার ঔজ্জ্বল্য-মহিমায় প্রকৃতির আলো ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ম্লান হয়ে গেছে। আমি তার পাশে গিয়ে বসলাম। একটু একটু করে কাছে গেলাম, আপন হলাম, কথা বলতে শুরু করলাম। সেও আমাকে আপন করে নিল। ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে লাগল। এমন সময় আমার সঙ্গী বলল, চলো, এখন যেতে হবে। আমার সাধ্য ছিল না তার কথা অমান্য করার। তাই উঠে আসতে লাগলাম। তখন আমার প্রেয়সী, আমার প্রিয়তমা আইনা আমার কাপড় টেনে ধরল। আর কাছে এসে বলল, (তুমি তো রোযা রেখেছো) ইফতার অবশ্যই আমার সঙ্গে এসে করবে।

ঠিক ঐ সময়ই তোমরা আমাকে জাগিয়েছ। আর সজাগ হয়ে আমি বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ আমি স্বপ্নের জগতে ছিলাম।

তার কথা শেষ না হতেই ঘোষণা আসল– এক্ষণ, এই মুহূর্তে সবাই বেরিয়ে পড়ো অমুক অভিযানে। সঙ্গে সঙ্গে সবাই বেরিয়ে পড়ল। আল্লাহর শত্রুদের সঙ্গে তুমুল লড়াই হল। ঠিক যখন সন্ধ্যা নেমে এল। রোযাদারের ইফতারের সময় হল তখন– ঠিক তখনই ঐ যুবক শাহাদাত বরণ করল।

আমাদের আবু হামেদ, মারওয়ান-যবীহুল্লাহর যবানেও সর্বক্ষণ শোনা যেত আইনার কথা। এমনকি নিজেকে সে মারওয়ান-যবীহুল্লাহ বললেও সঙ্গী সাথীরা তাকে "খাতিবুল আইনা" উপাধিতে ডাকত। যার বাংলা অর্থ হচ্ছে– জান্নাতী হুরকে বিবাহের প্রস্তাব দানকারী। সংক্ষেপে বলা যায় "হুরের বাগদত্তা"।

আল্লাহ যেন তার এই স্বপ্নও পূরণ করেন এবং আমাদেরকে তার সঙ্গে জান্নাতুল ফেরদাউসে একত্রিত করেন– আমীন।

আবু হামেদের কিছু গুণ ও বৈশিষ্ট্য

দুনিয়াবিমুখতা ছিল তার সবচেয়ে বড় গুণ। এক চিঠিতে সে লিখেছিল, আমি দুনিয়ার সমস্ত লোভ-আকর্ষণকে পায়ে মাড়িয়ে, দুনিয়ার সকল দর্পকে দু'পায়ে চূর্ণ করে তবেই এসেছি জিহাদের ময়দানে।

জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহর প্রকৃত গুরুত্ব হৃদয়ের গভীর থেকে সে অনুধাবন করতে পেরেছিল। যার প্রমাণ বহন করে তার বেশ কিছু চিঠি, যেখানে সে আরব যুবকদেরকে অত্যন্ত দরদভরা কণ্ঠে আহ্বান জানিয়ে বলেছে–

"হে আমার আরব যুবক ভাইয়েরা! আফগান জাতির আজ তোমাদেরকে ভীষণ প্রয়োজন। বেঁচে থাকার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের যেমন প্রয়োজন। কারণ দীর্ঘ মেয়াদী যুদ্ধ তাদেরকে বড় করুণ অবস্থার মধ্যে ফেলে দিয়েছে। তাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। এখনো সময় আছে, তোমরা এসো, তাদের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে আল্লাহর ফরজ বিধান জিহাদে শরীক হও। আফগানরা তো যুদ্ধে যুদ্ধে এতটাই বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত যে দ্বীন শিখার সুযোগটুকু পর্যন্ত তারা পাচ্ছে না। তোমরা এসো, ওদেরকে দ্বীন শিখাও। ওদের মাঝে হেদায়েতের আলো ছড়াও। মসজিদ, মাদরাসা ও খানকা কায়েম করো। ওদের তালীম-তারবিয়াত ও ইছলাহের ব্যবস্থা করো।"

অন্য এক চিঠিতে সে লিখেছে–

"তোমরা যারা আল্লাহর নূরে নিজেকে নূরান্বিত করতে চাও, যারা শত বাধা পেরিয়ে হাজারো কষ্ট ভোগ করে আল্লাহকে পেতে চাও। তোমাদেরকে স্বাগতম। চলে এসো নূরের ছোহবতে, সাহাবায়ে কেরামের বরকতময় জীবনের সান্নিধ্যে। সাহাবীদের জীবন মানেই রাতের আঁধার, উঁচু উঁচু পাহাড়, ঘোড়া-গাধার বাহন, শুকনো রুটি, আর তেল-সিরকার ব্যঞ্জন,

ক্ষুধা-অনাহারে পেটে পাথর স্থাপন, পায়ে হেঁটে মাসের পর মাস মরুভূমি সন্তরণ– ব্যস্ এই হল সাহাবীদের জীবন। এ পথে চললে সাহাবায়ে কেরামের সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক হয়ে যাবে। তাদের বরকতময় যিন্দেগীর সঙ্গে আমাদের তুচ্ছ জীবনের বাস্তব বন্ধন তৈরি হবে। যেমন বন্ধন রয়েছে তাদের চিন্তা ও আত্মার সঙ্গে।"

সে আরো লিখেছে–

"জিহাদ করা দরকার অন্যের প্রয়োজনে না; বরং নিজের প্রয়োজনে। কারণ জিহাদ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে। হৃদয়বৃত্তিকে শাণিত করে। সর্বোপরি মুমিনের সমগ্র সত্তাকে পূর্ণাঙ্গ ইসলামের ছাঁচে গড়ে তোলে এবং পরিচালিত করে। ফলে ঈমানের নূর ও চেতনা তার রক্তে মাংসে মিশে যায়। পরিণতিতে সে দৈহিক ও আত্মিক সমস্ত রোগ-বালা থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ থাকে।"

চিঠির শেষ পর্যায়ে গিয়ে সে লিখেছে–

"পাহাড়ের চূড়ায় কামান দাগিয়ে শত্রুর বিমান ভূপাতিত করা নিত্যনতুন রমণী নিয়ে বাসর করার চেয়ে হাজার গুণ শান্তি ও আনন্দের।"

শহীদ জামাল মুহাম্মাদ নাসির আল জানিনিয়্যি

(আবু দোজানা)

আবু মুসার পবিত্র ভূমি, কী হলো তোমার, কেন তোমার কলিজার টুকরা সন্তানগুলোকে যুদ্ধের ময়দানে ঠেলে দিচ্ছো! কেন তাদেরকে লড়াইয়ের তপ্ত কড়াইয়ে ছুঁড়ে দিচ্ছো। আবু হানীফার এই জন্মভূমিকে কি তুমি যুদ্ধ খেলার বাজির বস্তু বানিয়ে দিলে। নাকি ভাবছো এ মাটিকে আবার মর্যাদা ও গৌরবের মালা পরাবে!? হে হুজাইফার গৌরবময় ভূখণ্ড। আজ ইজ্জত ও সম্মানের জন্য কিন্তু চড়া মূল্য পরিশোধ করতে হবে! একটু ভেবে দেখো।

একটু চিন্তা করো! হে মর্যাদা ও গৌরবের উত্তরাধিকারী মহান দেশ, পথ কিন্তু অনেক দীর্ঘ। মূল্য কিন্তু খুব চড়া!! আর কষ্ট সেতো হিসেব ছাড়া!!!

অবশ্যই তুমি তোমার সন্তানদের শাহাদাত লাভে এবং তাদের চিরস্থায়ী সফল জীবন লাভের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তীদের সাথে অন্তর্ভূক্ত হওয়াকে নিজের জন্য গৌরবের বিষয় মনে করো। যেমন আল্লাহ বলেছেন-

"যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়েছে তাদেরকে তোমরা মৃত ভেবো না, বরং তারা জীবিত। তাদেরকে রিযিক প্রদান করা হয় তাদের রবের নিকট। তোমার যেসব সন্তানরা হুরের সান্নিধ্যে আজ আনন্দময় জীবন উপভোগ করছে তাদের উদ্দেশ্যে কবির সুরে সুর মিলিয়ে যেন তুমি হামেশা বলে যাচ্ছো-

"দরিদ্রতার মাঝেই বুঝি সচ্ছলতা খুঁজে পাও,
রণক্ষেত্রে মরণেই তবে অনন্ত জীবন পেয়ে যাও।"

যাইহোক, আজ আমি বলতে চাই এমন এক মরণজয়ী সিংহ শাবকের কথা যুদ্ধের গোলা-বারুদের তাপে কান্দাহারের তপ্ত মাটিকে সিক্ত করতে যে এসেছিলো ইয়ামানের সর্ববৃহৎ কবীলা থেকে- জামাল মুহাম্মাদ নাসির বা আবু দোজানা ইয়ামানী। জীবনের সব সাজসজ্জা আর ভোগ-বিলাস ত্যাগ করে সে চলে এসেছিলো এই মহান ভূমিতে। প্রশিক্ষণকেন্দ্রে যখন সে ভর্তি হয়েছিলো তখনই তার মাঝে দেখা গিয়েছিলো সুউচ্চ মনোবল ও উদ্দীপনা। তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের কারণে সে স্থান পেয়েছিলো আরবের সবচে' জানবাজ মুজাহিদদের দলে। এভাবেই লড়াইয়ের ময়দানে একের পর এক পা রাখে বিশ্বের অসংখ্য অগণিত মুসলিম যুবক।

জিহাদের বিষয়ে তার ঐকান্তিকতা

আবু দোজানা সর্বদা তার মুজাহিদ সহকর্মীদের নামাযের ক্ষেত্রে হানাফী মাযহাবের অনুকরণ করতে পরামর্শ দিতো। যাতে জিহাদ করা সহজসাধ্য হয়। একবার যুদ্ধের ময়দান থেকে সাময়িক বিরতি নিয়ে সে তার পরিবারের সাথে হজ্ব পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবে গিয়েছিলো। সেখানে গিয়ে সে বিভিন্ন ঝামেলায় আটকে পড়লো। সবচেয়ে বড় ঝামেলা ছিলো এই যে, তার পরিবার তাকে বিয়ে করানোর জন্য উঠে পরে লাগলো। তখন সে রিয়াদে ভ্রমণ করার নাম দিয়ে সোজা চলে আসে পাকিস্তানে। পাকিস্তান আসার পর সে তার সহকর্মী মুজাহিদ ভাইদের যা বলেছিলো তা সমস্ত মুজাহিদদের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সে বলেছিলো- "দুনিয়ার মানুষ্য হুরকে ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম জান্নাতের আয়না হুরের কাছে।"

কান্দাহারের পথে

আবু দোজানা যখন পেশওয়ার গিয়ে পৌছলো তখন আবুল জুদ নামের তার এক বন্ধু তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এখন কোথায় যাবো! সে বললো কাবুলে। তখন সেই বন্ধু তাকে বললো, চলো দুজন মিলে কান্দাহারের কমাণ্ডার মোল্লা আবুল গণীর কাছে চলে যাই; অতঃপর দুজন তার কাছেই চলে গেলো।

ময়দানে যাওয়ার পরম আগ্রহ

কান্দাহার ময়দান। প্রচণ্ড লড়াই চলছে আল্লাহর শত্রুদের সাথে। যুবকরা প্রতিযোগীতা করছে মৃত্যুর পেয়ালায় চুমুক দেয়ার জন্য এবং শেষ পর্যন্ত চুমুক দিতে পারলো বেশ কয়েকজন আরব যুবক। কিন্তু আবু দোজানার নসীবে জুটলো না একটি চুমুক! তিনদিন পর যখন আবারো লড়াইয়ের ময়দান উত্তপ্ত হয়ে উঠলো, তখন তাকে সামনের পয়েন্টে চলে যাওয়ার আদেশ করা হলো। সে কমাণ্ডারের কাছে আবদার করলো যেন তাকে

এখানে থেকে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়। কিন্তু আবদার গ্রহণ করা হলো না। তাকে পাঠানো হলো আবদুর রাজ্জাক নামের অন্য এক কমাণ্ডারের কাছে। আর সেখানে তখন লড়াই পৌছে গিয়েছিলো চরম পর্যায়ে। মৃত্যুর পেয়ালা ছিলো তার তপ্ত ঠোটের অতি নিকটে এবং সবশেষে সে চুমুকও দিতে পারলো, এবং... এবং লাভ করলো পরম সত্তার সান্নিধ্য। কান্দাহারের একটি নিকটবর্তী স্থানে চিরদিনের জন্য শায়িত করা হলো আবু দোজানা নামের এই মর্দে মুজাহিদকে।

আল্লাহর রাস্তার জখম

আবু দোজানার শরীরের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছিলো জখমের দাগ, ডান হাতের উপর বোমার অনেকগুলো ভাঙ্গা টুকরো পাওয়া গিয়েছিলো। একটি সহীহ হাদিসে আছে, "আল্লাহর রাস্তায় জখম হওয়া ব্যক্তি কেয়ামতের দিন ঠিক এমন অবস্থায় আল্লাহর সামনে আসবে জখম হওয়ার দিন তার যেমন অবস্থা ছিলো। রক্তে রঞ্জিত থাকবে; কিন্তু শরীরের গন্ধ হবে মিসকের মতো।"

আবু দোজানা যখন আমাদের ছেড়ে চলে যায় তখন তার বয়স ছিলো পঁচিশ বছর।

কবি বলেন-

"তরবারির ধার শেষ হওয়ার আগেই তার আয়ু শেষ হয়ে গেলো।"

কিন্তু আমরা কখনো কবির মতো বলবো না, আমরা তো বলবো সেভাবে আল্লাহ তায়ালা বলছেন যেভাবে-

"যারা আল্লাহর রাস্তায় কতল হয়েছে তাদের তোমরা মৃত বলো না। বরং তারা তো জীবিত কিন্তু তোমরা তা উপলব্ধি করতে পারো না।"

হ্যাঁ তারা জীবন্ত, চিরজীবন্ত থাকবে আমাদের স্মরণে। বরং তারা তো এতটাই জীবনীশক্তির অধিকারী যে, 'দ্বীন' নামের চারাতে তারা জীবনীশক্তি সঞ্চার করে। তাদের টকটকে লাল রক্ত দ্বারা সেই 'চারাকে' সিঞ্চিত করা হয় আর তাদের ক্ষতবিক্ষত দেহাঙ্গের দ্বারা তৈরী করা হয় সেই চারার গিযা বা খাদ্য; তো এমন জীবনের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীবন কী হতে পারে, যে জীবন অন্য জীবনের মাঝে জীবনী শক্তি সঞ্চার করে। রক্তের জলপ্রপাত সৃষ্টি করা ছাড়া এমন জীবন লাভ কিছুতেই সম্ভব নয়।

উবাইদার প্রথম শহীদ

আবু রুকাইয়াহ হাসান মুহাম্মাদ হাদী

মা'রাব হচ্ছে 'সাবা' সভ্যতার কেন্দ্রভূমি এবং সাবা সম্প্রদায়ের নির্মিত বিরাট বাঁধ দ্বারা রক্ষিত শহর। যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

"অবশ্যই সাবা সম্প্রদ্রায়ের বাসভূমিতে রয়েছে নিদর্শন, সেখানে ছিল দুটি বাগান বাসভূমির ডানে এবং বামে, তাদেরকে বলা হয়েছিল তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের দেয়া রিযিক থেকে আহার করো, এবং শোকর করো তার। তোমাদের বাসভূমি উত্তম বাসভূমি, আর তোমাদের রব ক্ষমাশীল রব।"

কালের সাক্ষী ঐতিহাসিক সাবা– সেই বাঁধের ধ্বস দেখেছে। তার দুই সন্তান আউস খাযরাজের মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরত দেখেছে। এই আউস-খাযরাজের উত্তরসুরীরাই ইসলামের সেই মহান সাহাবা যারা ছিলেন ইসলামী সভ্যতার মূল ভিত্তি এবং তার রূপ কাঠামো।

তারপর পরবর্তী যুগগুলোতে এই ভুমি তার পরবর্তী সন্তানদের জন্য শিক্ষার আলোচনা করে। কেননা তাতে রয়েছে আনুগত্য সুফলের শিক্ষণীয় ইতিহাস। রয়েছে বিভিন্ন সমাজের ধ্বংসের দৃষ্টান্তমূলক বিবরণী। এই

ভূমিতেই শিকড় গেড়েছে 'উবাইদা' এবং শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করেছে তার।

তারপর এই বিশাল সম্প্রদায়ের মাঝ থেকে উদিত হলো এক মহান ব্যক্তিত্ব যিনি আপন সততা ও পরহেযগারিতা দ্বারা সবার মাঝে পরিচিত হয়েছেন। বরং তিনি এক মহান বৃক্ষ যা উত্তম ফলে ফলবান। ঠিক যেমন আল্লাহ পাক বলেন-

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ.

"তুমি কি দেখোনি, কিভাবে আল্লাহ পাক উদাহরণ পেশ করেছেন? একটি উত্তম কথা– এমন একটি উত্তম বৃক্ষের মত, যার শিকড় সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত আর শাখা-প্রশাখা সুউচ্চ আসমানে (বিস্তৃত)। তা তার প্রতিপালকের আদেশে সবসময় ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উদাহরণসমূহ পেশ করেন যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে।" [সুরা ইবরাহীম- ২৪, ২৫]

এই মহান ব্যক্তি ছিলেন সততা ও সত্যানুগামিতার জীবন্ত উদাহরণ। তিনি উবাইদা ও মারাবের শায়খ– আলী আল আবাদাহ। তার পবিত্র ঘর থেকেই বের হয়েছে সৎ সন্তানগণ। আমরা তাদেরকে এমনই মনে করি- বাকি আল্লাহই ভালো জানেন। তার সন্তানরা ইসলামী দাওয়াতের সেই পথ এখনও ধরে রেখেছে।

আমাদের আলোচিত শহীদ এই ঘরেই প্রতিপালিত হয়েছে। তাই শৈশব থেকেই সে ইসলামী দাওয়াতে প্রভাবিত ছিল। ফলে সে সবার মাঝে সত্যানুগামিতা এবং সুন্দর চরিত্রের অধিকারী হিসাবে পরিচিত। তার বাবা তাকে তাইস শহরে অবস্থিত একটি একাডেমীতে পড়াশুনার জন্য পাঠান। সেটি ইয়ামানের প্রসিদ্ধ একাডেমীগুলোর একটি। সেখান থেকেই সে পড়াশুনা শেষ করেছে তাপর এক বছর শিক্ষকতা করেছে। সে বিভিন্ন মসজিদের খতীব হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছে।

ঐ অঞ্চলে কিছু লোক আছে নষ্ট চিন্তার অধিকারী, সাম্প্রদায়িক। তাদের আচরণ জাহেলী কবির নিম্নোক্ত কবিতায় ফুটে উঠেছে–

'আমি হলাম সম্প্রদায়ের অনুগত,
তারা মন্দ পথে চললে আমিও চলবো।
আর যদি তারা ভাল পথে পরিচালিত হয়
তাহলে আমিও ভালো হবো।'

এই ভ্রষ্ট চিন্তা অধিকাংশ সময়ই ভালো ভালো লোকদেরকে এবং পুরো সম্প্রদায়কে ধ্বংস ও বরবাদির দিকে নিয়ে যায়। এর কারণ হচ্ছে জাহেলী জাত্যাভিমান এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামি। সেসব লোকেরা হাসান মোহাম্মাদ হাদীকে ভালো চোখে দেখতো না। কারণ একটাই, সে তার কবিলাকে খারাপ কাজে একদম সমর্থন করতো না।

আবু তারিখ ইবনে শায়খ আলী আর-রাদাহ বলেন, 'আমি এই যুবককে ছোটবেলা থেকেই কল্যাণ কাজে অগ্রগামী দেখেছি।'

ছোটবেলা থেকেই সে হিশাম দাইলামীর বিভিন্ন অভিযানের ঘটনা শুনতো। এছাড়াও মহান মুজাহিদ আহমাদ আল-আহমদী এবং আবু মুহাম্মদ আল ইয়ামানী এবং অন্যান্য শহীদের বীরত্বগাঁথা শুনতো। এভাবে সেও তার অন্যান্য ভাইদের সাথে জিহাদে চলে এল যাদের একমাত্র প্রেরণা ছিল জান্নাতের সুসংবাদ সংবলিত শাহাদাতের হাদীসসমূহ।

সহীহ হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

"শ্রেষ্ঠ শুহাদা তারা যারা প্রথম কাতারে থেকে লড়াই করে; শাহাদাতবরণ পর্যন্ত পিছনে ফেরে না। তারাই জান্নাতের সর্বোচ্চ বালাখানায় অবস্থান করবে, তাদের রব তাদের দিকে তাকিয়ে হাসেন। তোমাদের প্রতিপালক কোথাও কোন বান্দার দিকে তাকিয়ে হাসলে তার কোন হিসাব হবে না।'

অন্য হাদীসে এরশাদ হয়েছে, "শ্রেষ্ঠ শুহাদা তারা যাদের রক্তক্ষরণ হয়েছে এবং যাদের বাহন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।"

আবু রুকাইয়া জিহাদে এসেই প্রশিক্ষণ শিবিরে ভর্তি হলো। তখন সে আবু জুনাইদ আল-বাগদাদী পরিচালিত ফারইয়াবের উদ্দেশ্যে পরিচালিত সারিয়্যায়ে হামযার বিভিন্ন বীরত্বগাঁথা শুনে অভিভূত হলো এবং আবু জুনাইয়েদের অধীনস্ত হয়ে গেলো। আবুল জুনায়েদও তার সাহসীকতা ও বীরত্ব দেখে আশ্চর্য হয়েছিলেন। তিনি তার তাকওয়া ও খোদাভীরুতারও প্রশংসা করেছেন। আমরা এমনই জানি। প্রকৃত বিষয় আল্লাহই ভালো জানেন।

আবুল জুনাইদ পড়াশুনা শেষ করেছেন মদীনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। তারপর দ্বীনের খেদমতের উদ্দেশ্যে জিহাদের ময়দানে নিজেকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন। তাই আল্লাহ তাকে বিভিন্ন বিপদসংকুল জায়গা থেকে উদ্ধার করেছেন। একবার তিনি সিরিয়া পুলিশের হাতে পড়েছিলেন। তারা সাত মাস তাকে কারাগারের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে রেখে নির্যাতন চালিয়েছে শুধু এ স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য যে, সে আফগানিস্তানে ছিল। তারপর আল্লাহর রহমতে তিনি বেঁচে ফিরেছেন। আরেকবার রক্ষা পেয়েছেন ফ্রান্সের গোয়েন্দা সংস্থার হাত থেকে যারা তাঁকে বাগদাদের আমেরিকান সৈন্যদের নিকট সোপর্দ করার সব বন্দোবস্ত করে ফেলেছিল। তারপরও তিনি জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ অব্যাহত রাখলেন এবং একের পর এক বিজয় অর্জন করতে লাগলেন। যুগ যুগ ধরে মানুষের মাঝে তার প্রশংসা রবে। কবির ভাষায়-

শত্রু কভু তার ঘোড়ার পৃষ্ঠ নাহি দেখিতে পায়,
পতাকা নিয়ে তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন এমন সব ময়দানে,
সাহসী বীর ছাড়া যায় না কেউ সে সব স্থানে।

সারিয়্যায়ে হামযাহ ফারইয়াবের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলো। সে পথে তারা শিয়াদের হাতে প্রায় বন্দী হয়ে পড়েছিল। কিন্তু এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে তারা আল্লাহর রহমতে বেঁচে গেল।

ফারইয়াব যাওয়ার পর

ফারইয়াব যাওয়ার পর লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করা হলো। একসময় লড়াই শুরু হলো। রাশিয়ান বোমারু বিমাগুলো আরবদের ঘাঁটি লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ করতে লাগলো। কিন্তু বিজয়ের পর বিজয় অব্যাহত থাকলো। এক সময় রাশিয়ানরা তাদের প্রচার মাধ্যমগুলোতে প্রচার করতে লাগলো যে, আরবরা এখানে এসেছে পরিবেশ ধ্বংস এবং ওহাবীয়্যাত প্রচারের জন্য। এটা একটা গৃহযুদ্ধের পরিকল্পিত ছক মাত্র।

একদিন এক যুদ্ধ ক্ষেত্রে হালকা অস্ত্র নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করার সময় আবু রুকাইয়ার বুকে একটি বুলেট বিদ্ধ হলো। আবুল জুনাইদ আমাদের কাছে পরামর্শ চেয়ে পাঠালো। তাদের নিয়ে কী করা উচিত। তখনো তারা শাহাদাতবরণ করেনি। তবে কিছুক্ষণ পরেই আবু রুকাইয়া শাহাদাতের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আপন প্রতিপালকের কাছে চলে গেলেন।

ধন্য তার শাহাদাতবরণ! ধন্য ‘উবায়দা’ তার সন্তানের শাহাদাতে! ধন্য শহীদের পরিবার! কারণ তাদের জন্য রয়েছে হাউজে কাউসারের পানি এবং আল্লাহর নিকট শাফাআত! যদি আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করেন। আমরা এমনটিই প্রত্যাশা করি। তবে আল্লাহর উপর দিয়ে কিছু বলার সাহস আমাদের নেই।

'জিহাদ' (পত্রিকায়) ছাপার জন্য আবু রুকাইয়ার প্রেরিত চিঠি

এ চিঠি তাদের উদ্দেশ্যে যারা বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় পদ দখল করে বসে আছেন আর জিহাদের জন্য পিপাসার্ত যুবকদের মনোবলে ফাটল ধরানোর কাজে লিপ্ত রয়েছেন। যারা মুজাহিদদেরকে সব জায়গায় পরিত্যাগ করেছেন আর মুজাহিদদের বিরোধিতা করাকেই নিজেদের একমাত্র কাজ হিসাবে নির্ধারণ করে নিয়েছেন। যারা দাঈ মুজাহিদদেরকে নিয়ে অনবরত উপহাস আর কটাক্ষ করে চলেছেন এবং এসব অপবাদে মুজাহিদদেরকে অভিযুক্ত করে চলেছেন যে, 'তাদের ইলমের কমতি আছে। তাদের বুঝ কম। তাদের তাফাক্কুহ ফীদ দ্বীন নেই। আকিদার ক্ষেত্রে তারা ভ্রান্তির শিকার।' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এ চিঠি তাদের উদ্দেশ্যে যারা উম্মাহর অবস্থা সংশোধন এবং শত্রুর মোকাবিলার পরিবর্তে সর্বদা মুজাহিদদের দোষ খুঁজে বেড়ান। যারা কথার ফুলঝুড়ি ছড়ান, কাজের বেলায় শূন্য। যাদের কাজই হচ্ছে সেসব মুজাহিদদের সত্যানুগামিতা এবং হক্কানিয়াত নিয়ে সন্দেহ ছড়ানো, যারা বাতিলের বিরুদ্ধে অটল পর্বতের ন্যায়।

এ চিঠি তাদের সবার উদ্দেশ্যে। নিম্মোক্ত পংক্তিগুলো নিসৃত হয়েছে তাদের কর্মকাণ্ডে ব্যথিত এক হৃদয় থেকে তাদের অবস্থার প্রতি শোকাহত হয়ে এ আশায় যে, হয়তো তারা উলামা ও মুাজহিদদের প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করবেন। হয়তো তারা সঠিক পথের দিশা পাবেন। সত্যের আরো কাছে, আরো নিকটে আসার সুযোগ পাবেন!

হে ঐ লোকেরা যারা জিহাদের গতিকে শ্লথ করতে চাও আর সীমান্তরক্ষী
মুজাহিদদের উপহাস করে বেড়াও!
নফসের ভ্রষ্টতা নিয়ে কেন চিন্তা করোনা?
হয়তো তুমি ধোঁকাগ্রস্ত– এই ভয় কি তোমার করে না?
ধ্বংস হোক সেসব পাপাচারীরা
দ্বীন বিদ্বেষীদের কামনা বাস্তবায়নে লিপ্ত যারা।

যদি দাঈদের গালি-গালাজ করাই অভ্যাস হয় তোমার,
তবে হাশরের দিন হবে তোমার জন্য বড়ই ভয়ংকর।
যদি জানতে চাও রুশদের শক্তি সম্পর্কে?
তবে জিজ্ঞাসা করো তাদের।
আরো জিজ্ঞাসা করো কত দীর্ঘ কাল আটকে রেখেছে তারা–
এ ভূমির অধিকার।
সুতরাং ছাড়ো সেসব কাজ যা মুজাহিদদের কষ্ট দেয়,
ছাড়ো তাদের প্রতি অপবাদের কাঁদা ছোঁড়া,
সেই যুদ্ধ ছেড়ে দাও যা শত্রুপক্ষ পছন্দ করে,
যা দীর্ঘকাল আমাদের মাঝে অব্যাহতভাবে চলছে।

শাহাদাত ও শহীদান

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি এক ও অনন্য। দুরুদ ও সালাম তার প্রতি যার পরে আর কোন নবী নেই।

এ মাসে বেশ কয়েকজন মুজাহিদ শাহাদাত বরণ করেছেন। বিশেষত আরব মুজাহিদগণ এ পর্যন্ত ৪৩ জন শাহাদতবরণ করেছেন। যুদ্ধক্ষেত্রে এখনও তীব্র লড়াই চলছে। বিশেষত জালালাবাদ ও খোস্তে লড়াই তীব্র আকার ধারণ করেছে। এমনকি এম্বুলেন্স প্রয়োজন পূরণে ব্যর্থ হচ্ছে। অথচ লাজনাতুদ দাওয়াহ এবং কুয়েতের 'হেলাল' সংস্থার এম্বুলেন্স এত বেশী যে, খৃষ্টান মিশনারীদের এম্বুলেন্স তার তুলনায় কিছুই না। এছাড়াও অন্যান্য চিকিৎসা সেবার ক্ষেত্রেও এরা খৃষ্টান মিশনারীদের চেয়ে এগিয়ে। তবুও আহতদের বহনে এরা কুলিয়ে উঠতে পারছেনা। কুয়েতের 'ফাউযান' এবং 'হেলালের' হাসপাতালগুলো ভরে গেছে। লড়াই এতই তীব্র যে, এম্বুলেন্সগুলোর হর্ণ এবং হেডলাইট– গুলিবৃষ্টির ঝলক এবং শাঁ শাঁ আওয়াজের সামনে ম্লান হয়ে যায়। প্রতিদিনই সকাল-সন্ধ্যা কোন না কোন

বন্ধুকে হারাচ্ছি। তারা চলে যাচ্ছে। সাথে আমাদের হৃদয় ও আত্মাকে সাথে নিয়ে যাচ্ছে।

ইসলামী ইতিহাসের অন্যান্য ব্যক্তিদের জীবনের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো তাদের জীবন একটি উদ্দেশ্যে গিয়ে শেষ হয়েছে। আর তা হচ্ছে পরবর্তীদেরকে স্থলবর্তীরূপে রেখে যাওয়া। যেমন কোরআন কারীমে এরশাদ হয়েছে, "আর স্মরণ করো ঐ সময়কে যখন তোমার প্রতিপালক ফেরেশতাদেরকে বললেন, নিঃসন্দেহে আমি যমীনে একজন খলীফা বানাবো।"

তবে এ খেলাফত প্রদানে রাব্বুল ইযযত এতটি শর্ত দিয়েছেন, যেমন ইরশাদ হয়েছে,

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى. وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى.

"আর যখন আমার পক্ষ হতে তোমাদের নিকট কোন হেদায়াতনামা আসবে তখন যে আমার হেদায়েতনামা অনুসরণ করবে সে ভ্রষ্ট হবে না এবং দুর্ভাগা হবে না। আর যে আমার উপদেশ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে নিঃসন্দেহে তার জন্য রয়েছে অনটনপূর্ণ জীবন আর কিয়ামতের দিন আমি তাকে অন্ধ করে পূনর্জীবিত করবো।" [সুরা ত্বহাঃ ১২৩, ১২৪]

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব ইতিহাসের মূল কথা হচ্ছে– মানবীয় সক্ষমতা অনুযায়ী– আল্লাহর সিদ্ধান্ত এবং পার্থিব জীবনে আল্লাহর অমোঘ বিধান অনুসারে– আল্লাহর জমিনে আল্লাহর ইচ্ছার বাস্তবায়ন আকাঙ্ক্ষা। অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, সর্বদিক থেকে আপন সত্তাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষের আপ্রাণ চেষ্টা ও সাধনার নাম হচ্ছে মানব ইতিহাস। শুধু উদর পূর্তির জন্য খাদ্য অন্বেষণের নাম মানব ইতিহাস নয়। যেমনটা কাল মার্কসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বলা হয়ে থাকে। অনুরূপ শুধু ভোগ বিলাস, প্রভুত্ব ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকেও মানব ইতিহাস বলা যায় না। যেমনটা ভোগবাদী চেতনায় দেখা গিয়ে থাকে।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সর্বদিক থেকে মানুষের আপন সত্তাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করার অর্থ কী? এর অর্থ হচ্ছে– মানুষের যাবতীয় শক্তি ও সামর্থ, জ্ঞান ও যোগ্যতা, কৌতুহল ও উদ্দীপনা (প্রয়োজন ও প্রত্যাশার তাগিদে) সবকিছুর সার্থক বাস্তবায়ন এবং মানব প্রকৃতিতে প্রদত্ত যাবতীয় মৌলিক বিষয় ও বিশ্বাসকে এবং প্রাত্যহিক জীবনের সাধারণ বাস্তবতাকে একমুখী করে তোলার প্রচেষ্টা।

আরো স্পষ্ট করে এভাবে বলা যায় যে, কিতাব ও সুন্নাহকে মানব-জীবনে রূপান্তরিত করার প্রয়াসই মানব ইতিহাস। মানুষের চলা-বলা, আচার-ব্যবহার, স্বভাব-চরিত্র, বৈষয়িক লেনদেন সবকিছু হবে কুরআন ও সুন্নাহর অনুগামী। আয়াত ও হাদীসের জীবন্ত ব্যাখ্যা। নীতি ও আদর্শের বাস্তব প্রতিফলন। মানুষ এই জীবনাচারের মধ্য দিয়েই দেখতে পাবে একটি জীবন্ত আদর্শকে– একটি জীবন্ত ইসলামকে।

এটিই ইতিহাস। এটিই মানবেতিহাস। এটিই একইসাথে ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়েরই ইতিহাস। কেননা, ব্যক্তি ও সমষ্টি একটি আরেকটির সাথে ওৎপ্রোতভাবে জড়িত। এরা ঠেলাঠেলি করে একটি আরেকটির সাথে থাকে। একটিকে ছাড়া অন্যটি কল্পনাও করা যায় না।

মানবেতিহাসের বস্তুবাদী ও ভোগবাদী ব্যাখ্যা যে ভুল, ইসলামের ইতিহাসই তার সবচে বড় প্রমাণ। কারণ ইসলামের ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই, মাত্র অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে পৃথিবীর অর্ধেক বসতি অঞ্চল বিজিত হয়ে যায়। তারপর এই ইসলামী রাষ্ট্র এক হাজার শতাব্দীরও বেশী সময় ধরে পৃথিবীতে প্রবল প্রতাপের সাথে টিকে থাকে। এই দীর্ঘ সময় তা ছিল সেই হক্ব ও সত্যাদর্শের ধারক ও বাহক যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন সাইয়িদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। এই সময় মানুষের মাঝে ব্যাপক ধর্মীয় বিপ্লব সাধিত হয়েছে– উৎপাদন মাধ্যম এবং অর্থনৈতিক উৎসের তেমন কোন পরিবর্তন ছাড়াই।

একসময় আল্লাহর ইচ্ছায় হিন্দকুসের ওপাশে এক বিরাট ভূখণ্ডে রুশ বিপ্লব আছড়ে পড়ল। এমন এক জনগোষ্ঠির মাঝে তা প্রভাব ফেলল, যারা ছিল

জীবন ও জগত থেকে বিচ্ছিন্ন, দরিদ্র, নিরক্ষর। যাদের হাতে দুনিয়ার ভোগ সম্ভারের কিছুই পৌঁছেনি।

মার্কসবাদী এই ব্যাখ্যার অপরিহার্য দাবী হচ্ছে ইহকালীন উন্নতির জন্য পরকালীন উন্নতিকে ছুঁড়ে ফেলা, কেননা তাদের দৃষ্টিতে ধর্ম হচ্ছে এক আফিম যা প্রজাসাধারণের অনুভূতি শক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং রক্তচোষা কীট যা পজাসাধারণের রক্ত শুষে নয়।

ইতিহাসের মার্কসবাদী এই ব্যাখ্যার দুর্বলতা এবং ভ্রষ্টতা স্পষ্ট হয়ে গেছে। আর এটা প্রকাশ পেয়ে গেছে যে, সমাজতন্ত্র উন্নতি ও অগ্রগতি আর শ্রমিক অধিকার রক্ষার নামে আসলে এক মরিচীকা যার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠির পতঙ্গ দল। তারা এখন সমাজতন্ত্রের জাহান্নামে জ্বলে পুড়ে মরছে।

মূলত সমাজতন্ত্র মানবতার উপর চাপিয়ে দেয়া এক অভিশাপ যার ভোগান্তি আল্লাহ তাদেরই হাতে তাদেরকেই ভোগ করাচ্ছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

"আর তোমাদেরকে যে বিপদ আক্রান্ত করে তা তোমাদেরই কৃতকর্মের কারণে। আর অধিকাংশই তিনি ক্ষমা করে দেন।"

আমার মত হচ্ছে, সমাজতন্ত্র শীঘ্রই পরাস্ত হবে এবং তাদের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে যাবে। এখনই ভিতরে ভিতরে তারা বিভিন্ন অন্তর্মূখী সমস্যার শিকার হচ্ছে এবং বিভিন্ন গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছে, যার ফলাফল হচ্ছে বিচ্ছিন্নতা। এসবের সামান্য প্রকাশ ঘটেছে আযারবাইজান তাজিকিস্তান এবং (খৃষ্টান দেশ) জর্জিয়ায়। সামনের বছরগুলো শীঘ্রই দেখতে পাবে সমাজতন্ত্রে কত বিরাট পরিবর্তন ঘটে। গায়বের মালিক তো আল্লাহ, তবে অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে সমাজতন্ত্রের ধ্বংস ঘনিয়ে এসেছে, শীঘ্রই তারা সেসব গীর্জা আর পাদ্রীদের কাছে ফিরে যাবে যেগুলোকে তারা ইতিপূর্বে বর্জন করেছে।

এ বিষয়ে কথা বললে অনেক দীর্ঘ হয়ে যাবে।

ইতিহাস-সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা

আল্লাহর তাকদীর অনুযায়ী যে কোন জাতি বা গোষ্ঠির ইতিহাস এমন কিছু অনন্য ব্যক্তিত্ব নিয়েই রচিত হয় যারা তাদের রক্তে সে জাতিকে জগতের সামনে মেলে ধরেছে। যারা নিজেদের নম্রতা-কঠোরতা দ্বারা জাতির গৌরব-প্রাচীর সুদৃঢ় করে গেছে। মর্যাদার সুউচ্চ মিনার তৈরী করে গেছে। ইসলামের ইতিহাসও একইভাবে রচিত হয়েছে।

এখন এই আফগানিস্তানের ভূমিতেও ইসলামের গৌরব-মিনার তেরী হচ্ছে। তার উপাদান মুজাহিদীনের মস্তকসমূহ, পাথর কিংবা ইট সিমেন্ট নয়। এই আফগান মুজাহিদগণ এই উম্মতের সেই অংশ যারা ঘোর থেকে হুঁশ ফিরে পেয়েছে এবং গাফলত ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে এবং কালিমার পতাকা হাতে সম্মুখপানে এগিয়ে চলছে।

আর আগেই বলেছি, প্রতিটি জাতি তাদের অনন্য ব্যক্তিদের ইতিহাস সংরক্ষণ করে যাতে, পরবর্তী প্রজন্ম সেই চেতনা ও মূল্যবোধের উপর বেড়ে উঠে যার রোপন ও পরিচর্যার জন্য তাদের পূর্ববর্তীরা নিজেদেরকে কোরবান করেছে।

নতুন প্রজন্মকে মর্যাদাপূর্ণ কাজে উদ্বুদ্ধ করার জন্য সবচেয়ে কার্যকরী পদ্ধতি হচ্ছে তাদেরকে তাদের গৌরবময় ইতিহাস পাঠ করানো। যাতে রয়েছে বিভিন্ন যুগের আত্মশুদ্ধির মুর্শিদগণ, বীর সেনাপতিগণ এবং সাহসী সেনানীরা। তো আমরা রাসুলুল্লাহ সা. এর আদর্শ গ্রহণ করবো। সেই আলোয় আলোকিত হবো যা নিয়ে তিনি এসেছেন। এবং আমরা তার সাহাবাদের হেদায়াত অনুযায়ী চলবো এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবো। তারাই ঐ ব্যক্তিগণ যাদেরকে আল্লাহ হেদায়াত দান করেছেন। সুতরাং তাদেরই হেদায়াত অনুসরণ করুন।

যখনই জীবন্ত ব্যক্তিত্ব উদাহরণ হিসাবে পেশ করা হয় আর তাকে কেন্দ্র করে ঘটে যাওয়া ঘটনা হয় উদ্বুদ্ধকারক, তখন তার প্রভাব হয় গভীর এবং অন্তরে তার আছর পড়ে বেশী। কেননা বাস্তবে ঘটে যাওয়া ঘটনা মানুষকে খুব বেশী আকর্ষণ করে এবং মানুষ তা নিজের জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা

করে। কেননা হৃদয়ের গভীর থেকে তখন ডাক আসে এই বলে, তোমাদেরই মধ্য হতে এক যুবক যে তোমারেই মত বাস করে, তোমাদেরই মত তার পরিবেশ পরিস্থিতি অথচ সে কত এগিয়ে গেল অথচ তোমরা কোথায় পিছনে পড়ে আছো? তোমরাও কি তার পথে চলতে পারো না? সে যেভাবে চলে সেভাবে চলতে পারোনা?

কঠিন পরিস্থিতি

অনেক সময় আমরা এক কঠিন পরিস্থিতির শিকার হই, তা হচ্ছে- অনেক শহীদ আপন অসিয়ত পত্রে লিখে যান– আমার সম্পর্কে যেন কেউ কিছু না লিখে, যেমন সাদ আর রাশুদ লিখেছেন: আমি 'জিহাদ' এবং 'বুনইয়ানে মারছুছ' পত্রিকাকে আমার সম্পর্কে একটি শব্দও লিখার অনুমতি দিবো না।

আবু দুজানা আদিল ফারিস অসিয়ত করেছেন তার সম্পর্কে যেন কিছু না লেখা হয়। আবু মুসলিম আস সানাআনী অসিয়ত করেছেন তার সম্পর্কে যে কিছু লিখবে কিয়ামতের দিন আবু মুসলিম আল্লাহর সামনে তার বিরুদ্ধে বিচার দায়ের করবে।

আমি অনেক চিন্তা করেছি, এটা কি ঠিক হবে যে, তারা মানুষকে তাদের সম্পর্কে উত্তম কথা বলতে বাঁধা দিয়ে রাখবে? তারা তো এই উম্মাহের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হয়েছে। আর পিছনে ইতিহাসের গুরুত্ব নিয়ে যে আলোচনা গত হয়েছে তা থেকে স্পষ্ট যে, কারোই উম্মাহার ইতিহাস লুকানোর কোন অধিকার নেই। আর এরা তো নিজেদের রক্ত দিয়ে এই দ্বীনের গাছকে সিঞ্চন করেছেন এবং নূরের হরফে এই উম্মাহর ইতিহাস রচনা করে গেছেন।

যদি শুরু থেকে তথা আবু বকর খোলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি আলাইহি আজমাঈন এবং অন্যান্য সাহসের অধিকারী বীর সেনানীগণ (যাদের মধ্যে আছেন সা'দ, মুসআব, হামযাহ, কাকা', আছিম, মিকদাদ, নুমান, ইকরামা, খালিদ এবং আবু উবাইদা) যদি এসব

হীরকখণ্ড ও আলোর মিনারের ইতিহাস এই উম্মাহর কাছ থেকে গোপন রাখা হতো, তাহলে এসব প্রজন্ম কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হতো– কল্পনা করা যায়? পরবর্তী প্রজন্ম তাহলে কত বড় মিষ্ট পানির ঝর্না থেকে বঞ্চিত হতো! ভাবতে পারেন?

এই মহান ব্যক্তিদের সীরাত কোন যুগেই কোন ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল না, আর না ছিলো কোন মাল যা সম্পর্কে তিনি ভাল কাজে ব্যয়ের অসিয়ত করবেন এবং যেভাবে ইচ্ছা খরচ করবেন। বরং তা উম্মাহর সম্পদ যা পাঠ করে গড়ে উঠেছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। যার অনুসরনে জীবন কাটিয়েছেন আমাদের আকাবিরগণ।

যারা নিজেদের সম্পর্কে লিখতে নিষেধ করেছেন তাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে রিয়ার গান্দেগী থেকে বেঁচে থাকা এবং অপ্রসিদ্ধির অন্ধকার জগতে পড়ে থাকা আর শুহরতের আলোকিত জগত থেকে দূরে থাকা। তারা তা করেছেন নিয়তের পরিপূর্ণ বিশুদ্ধতা এবং ইখলাসের সুপ্রতিষ্ঠার জন্য, সুতরাং তারা তাদের সত্যবাদিতা ও একনিষ্ঠার সওয়াব পেয়ে যাবেন আল্লাহর কাছে।

যদি আমি সাদ আর রুশদ সম্পর্কে না লিখি তাহলে আমার অনেকটা কষ্ট হবে। কেননা সে ছিল এমন ব্যক্তি যে, আমি তার সামনে বসলে মনে হতো, আমি চরিত্রের এক বিশাল সুউচ্চ মিনারের সামনে বসে আছি; অথচ সে সাধারণ শিক্ষায় মাধ্যমিক স্তরও পার হয়নি।

আর এখন আমরা মুখোমুখি হয়েছি আবু মুসলিমের অছিয়তের আমার কাছে যা বাস্তবায়িত হওয়ার অর্থ হচ্ছে ইসলামী উম্মাহ ও ইতিহাসের এক উজ্জ্বল পাতা হারিয়ে যাওয়া এবং এক জীবনে সিলসিলার ফিতা কেটে দেওয়া যাকে ঘিরে আছে আলো ঝলমলে ইতিহাস, যাকে আলোকিত করে আছে সুউচ্চ আলোক মিনার। তা এমন এক অনন্য সৌন্দর্য যা যুগযুগ ধরে আপন সৌন্দর্যে অটুট থাকবে।

বরং বলা যায় শহীদদের সম্পর্কে আলোচনা করা রাব্বুল আলামীনের পক্ষ হতে ফরজ কেননা তা লড়াইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণের একটি পন্থা আর লড়াইয়ের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ এবং লড়াই উভয়ই ফরয যেমন ইরশাদ হয়েছে-

"আর আপনি লড়াই করুন আল্লাহর রাস্তায়, আপনাকে শুধু আপনারই দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, আর মুমিনদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে থাকুন।"

যদি শহীদরা জানতো যে, এর উসীলায় আল্লাহ তাদেরকে কত কল্যাণ দান করবেন এবং তাদের আলোচনা করলে আল্লাহ তাদের কবরে কত সাওয়াব পৌঁছে দিবেন তাহলে তারা এমন অছিয়ত করা থেকে অবশ্যই অবশ্যই বিরত থাকতো।

কত মৃত হৃদয় শুহাদার ঘটনা শুনে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে! কত যুবক একজন শহীদের ঘঠনা পড়েই ছুটে এসেছে জিহাদে! কত দিশেহারা কত পাপাচারী এসব ঘটনা শুনে আপন প্রতিপালকের নিকট তাওবা করেছে!

নিহতদের মাঝেই আছে পরবর্তী প্রজন্মের প্রাণ আর বন্দীদের জন্য তারা ফিদয়া ও মুক্তিপণ। এরা ভুলেই গেছে সেই হাদীস যাতে ইরশাদ হয়েছে, "যে ইসলামে কোন উত্তম সুন্নাহ প্রবর্তন করবে তার জন্য তার প্রতিদান এবং কিয়ামত পর্যন্ত সেভাবে যে আমল করবে তারও প্রতিদান।"

শহীদ আব্দুল ওহহাব ইবনে সালিহ আর রিদ্দাহ আল গামিদীর অসিয়ত দ্বারা আল্লাহ কত মানুষের উপকার পৌঁছেয়েছেন। তো যখন আবু মুসলিম (আব্দুল্লাহ আল নাহিমী) এর অসিয়তের খবর শুনলাম তখন মনে মনে বললাম, অবশ্যই আমি তার সম্পর্কে লিখবো আর যখন আল্লাহর সামনে তার সাথে সাক্ষাৎ হবে তখন আল্লাহকে আরয করবো-

"হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আপনার এই বান্দা আব্দুল্লাহ আন নাহিমী তার সম্পর্কে না লিখতে দিয়ে মানুষকে কল্যাণবঞ্চিত করতে চায় এবং মানুষকে কল্যাণাদেশ এবং লড়াইয়ের উদ্বুদ্ধকরণ থেকে বাঁধা দিতে চায় আমাদেরকে তার সম্পর্কে লিখতে বাঁধা দিয়ে।" সেজন্যই আমি তাকে দিয়েই শুরু করবো–

আবু মুসলিম আস সানআনী (আব্দুল্লাহ আন নাহিমী)

ইয়ামানে এমন কোন মসজিদ নেই যা তোমার মুখ থেকে আফগানিস্তান সম্পর্কে শুনেনি; এমন কোন সৎ নারী নেই যে তোমার মুখ থেকে জিহাদে দান করার ফজীলত শুনার পর তার গহনা খুলে দেয়নি। ইয়ামানে এমন কোন যুবক নেই যারা খুশু অবলম্বনকারীদের স্রোতে ভেসে এসেছে, অথচ তোমাকে চেনেনি; এমন কোন আলেম নেই যে তোমার সামনে এসে কিংবা তোমাকে দেখে নিজেদের অবস্থানে লজ্জিত হয়নি।

সুতরাং হে আল্লাহর বান্দা! যদিও তুমি অসিয়তে লিখেছো "যে আমার সম্পর্কে একটি শব্দও লিখবে আমি কিয়ামতের দিন তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবো' কিন্তু কিভাবে আমরা তোমার সম্পর্কে না লিখে পারি? আতরওয়ালা কি সুগন্ধি ছড়াতে বাঁধা দিতে পারে? নাকি আতরের সুঘ্রাণে পরিবেশ এমনিতেই মৌ মৌ করে উঠে?

তুমি কি চাও যে, জিহ্বাগুলোকে কল্যাণের আলোচনা এবং সৎ কাজের প্রচারণা থেকে বাঁধা দিবে? হৃদয় যখন ভালবাসায় উথলে উঠে এবং মুগ্ধ হয়ে যায় তখন কি তাকে তার মুগ্ধতা ও ভালোবাসার প্রকাশে কেউ বাঁধা দিতে পারে? যদি জিহাদের ময়দানে তোমার বীরত্ব সম্পর্কে নাও লিখি কিন্তু তোমার ইয়ামানী ভাইদেরকে তোমার অশ্রুভেজা আলোচনা থেকে কিভাবে বাঁধা দিবো?

লেবু বিক্রেতা

একবার জেদ্দায় আবু আব্দুল্লাহর ঘরে সে আমার সাথে সাক্ষাৎ করে, আমি তো আবার এক প্রিয় ভাইয়ের সাথে দেখা করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। সে আমার সাথে যেতে চাইলো, তাই আমি তাকে বললাম, তোমার উচিৎ তোমার কাপড় পরিবর্তন করা। মানুষ তোমাকে না লেবু বিক্রেতা মনে করে বসে। আমি বলেছি দুষ্টামী করে। সে শুনে দু গাল ভরে হাসলো। এরপর থেকে যখনই তার সাথে দেখা হতো তখনই সে বলতো, লেবুর খবর কী?

যদিও ইতিহাস তোমার স্মরণ থেকে চুপ থেকে যাবে। কিন্তু ঐসব লোকদেরকে তুমি কীভাবে চুপ করিয়ে রাখবে যারা জিহাদে তোমার সঙ্গী ছিল কান্দাহারে, আমার ক্যাম্প খোলদান্দে, খোস্তে, নিনজাহারে, এবং জালালাবাদে? সুতরাং তোমার সকল চেষ্টা বৃথা!

হে তিরষ্কারকারী! তোমার তিরষ্কার সব হাওয়ায় উড়ে যাবে,
সেজন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।
সুতরাং কোন লাভ নেই তিরষ্কার করে,
যদিও তুমি ন্যায়প্রার্থী।
তোমার খাঁটি নসীহতও আমার কোনই কাজে আসবে না।
কারণ প্রেমিক তো তিরষ্কার কানে নেয় না।

জিহাদের প্রথম সঙ্গীরা

আব্দুল্লাহ ছিল সেসব লোকদের অন্তর্ভূক্ত, যাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অসংখ্য মুসলিম যুবক জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিল। পঞ্চাশ উর্ধ্বে শায়খ গায়লান আবু ফারি। তারা এসেই আফগানিস্তানের ভিতরে জিহাদে শরীক হল। গায়লান এসেছিল, সাথে তার সমস্ত সম্পদ নিয়ে এসেছিল, বয়সের ভার তাকে বেঁধে রাখতে পারেনি, আর না সম্পদের প্রাচুর্য। অবশ্যই আব্দুল্লাহও এক বিরাট সম্পদ সাথে নিয়ে এসেছিল। সেবার আব্দুল্লাহ একটা দীর্ঘ সময় থাকার পর ইয়ামানে ফিরে গিয়েছিল। এর কারণ অবশ্যই অন্য। সেটা হচ্ছে তখনও তাদের থাকার বিশেষ কোন ব্যবস্থা ছিল না। কারণ তখনও "খেদমতে মন্ত্রণালয়" চালু হয়নি।

কিন্তু যে অন্তরে একবার জিহাদের স্বাদ প্রবেশ করে তার জন্য স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাওয়া খুবই কষ্টকর, তখনও না খাবারের স্বাদ ভাল লাগে আর না পোষাকের স্বাদ, তখন মসজিদে অথবা কোন বদ্ধ কামরায় কোন দ্বীনি বই পড়াটা কিছুটা ভাল লাগে।

তাই কিছুদিন না যেতেই তার প্রচণ্ড আগ্রহ জাগলো জিহাদের পথে ফিরে আসার জন্য। তারপর তার কিছু ভাই তাকে এই ফতোয়া শুনাল যে অবশ্যই তাকে শরয়ী ইলম অর্জন করতে হবে, যাতে সে আলেম দায়ী হতে পারে। এটা শুনার পর কিতাবাদি সংগ্রহের পিছনে খরচ করতে শুরু করলো। সাথে জিহাদের খেদমত তো ছিলই। সেজন্য প্রচুর সম্পদও জমা করেছিলো। তখন সে জিহাদের প্রচার এবং গোপনীয়তা– উভয় দিকেই সে ভারসাম্য রক্ষা করে চলতো।

শরীয়া অনুষদে

সৌদি আব্দুল্লাহ সৌদিতে এসে শরীয়া অনুষদে ভর্তি হল। সবসময় কিতাব সঙ্গে রাখতো, সবসময় আমি তাকে দেখতাম হয় ইমাম নববীর 'আযকার' অথবা ইবনুল কাইয়ুম জাওজিয়্যাহর 'ওয়াবেলে সাইয়্যিব' অথবা "জওয়াবুল কাফি লিমান সাআলা আনিদ দাওয়াইশ শাফি"। যেখানেই ফেতনা হয় দেখা যেতো সে ওয়ায়েজ হিসাবে তার দরসগুলো শুনাচ্ছে অথবা নীরবে কোন নসীহত শুনছে অথবা কিতাবুল্লাহর তেলাওয়াত শুনছে।

আর খোদাভীরুতা তো ছিলই। আমরা এমনটাই ধারণা করি। বাকি আল্লাহই সবকিছু ভালো জানেন। বেশীরভাগ সময় সে আখেরাত নিয়ে কথা বলতো অথবা কবরের আযাব সম্পর্কে অথবা জান্নাত অথবা জাহান্নাম সম্পর্কে আলোচনা করতো।

শায়খ উমর সাইফ ছিল এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, জান্নাত, হুর-গেলমান, প্রাসাদ, বালাখানা ইত্যাদি আলোচনায় সে ছিল পারঙ্গম। আর আব্দুল্লাহ আন নাহিমী ছিল কবরের আযাব আর কিয়ামত দিবসের ভয়াবহতা বিষয়ে আলাচনায় অনন্য।

জিহাদের পথে প্রত্যাবর্তন

এক দেড় বছর আগে জেদ্দায় আমীর সালমান মসজিদে একটি মুহাযারা পেশ করা হয়। সেই মুহাযারাটি ভিডিও করা হয়েছিলো। আব্দুল্লাহ আন নাহিমী মুহাযারার ভিডিওটি খুব মনোযোগের সাথে শুনছিল। তাতে একটি কাব্য ছিল-

'আফগান জিহাদ হলো একটি হারের বাজার, যে লাভবান হওয়ার সে লাভবান হচ্ছে আর যে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।'

আব্দুল্লাহ আমাকে বলেছে, এই বাক্য আমাকে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছে, তাই তখনি আমি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়ার প্রতিজ্ঞা করে নিলাম।

আব্দুল্লাহ আন নাহিমী সফরের জন্য প্রস্তুত হলো এবং সাদায় যেখানে আবু বুরহান তাকে দাঈ বানাতে চেয়েছিলো সেখানে চলে এলো। তারপর আবু আব্দুল্লাহ মুজাহিদ ক্যাম্পে চলে এলো। তারপর খোস্তেও গিয়েছিলো।

তারপর গেলো কান্দাহারে। আবু আব্দুল্লাহ এবং আবুল হাসান আন-নাহিমী উভয়েই কান্দাহারে ছুটে এলো। ঘটনা এই যে, আবুল হাসানকে ও আবু আব্দুল্লাহকে বিভিন্নজন বিভিন্ন দিকে পাঠাতে চেয়েছিল। শেষে সিদ্ধান্ত হলো কান্দাহারে পাঠানোর। কারণ সেখানে এমন কোন পরিবারই ছিল না কোনো যুবক যাকে ঘিরে থাকবে। তাই তাকেই পাঠানোর সিদ্ধান্ত হলো অন্তত দু'সপ্তাহের জন্য হলেও। অবশ্যই আবুল হাসান চাচ্ছিলো কাবুল যেতে, যাতে জিহাদে সক্রিয় হতে পারে। কিন্তু আবু আব্দুল্লাহ তাকে শেষে কান্দাহারে পাঠাতে পেরেছিলো।

জালালাবাদের পথে

নাহমী কান্দাহার থেকে ফিরে নিন্দাহারে চলে গেল যেখানে তখন যুদ্ধের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। সেটাই ছিল তার শেষ যাত্রা। নাহমী

ছিল তখন জালালাবাদ বিমানবন্দরে হামলায় ব্যস্ত। সে প্রাচীরের কাছে চলে গিয়েছিলো। বিমানবন্দরে কাফেরদের মাথাগুলো গড়িয়ে পড়ছিলো। মৃত্যু তখন তার জন্য অপেক্ষা করছিলো দেয়ালের উপর। সেটা ছিল ১৮ই শাবান ১৪০৯ হিজরী মোতাবেক ২৫ই মার্চ ১৯৮৯ ইং। আব্দুল্লাহ কোরআন তেলাওয়াত করছিলো, হঠাৎ তার নিকটে 'হাউন' গোলা এসে পড়ল। একটি শেল তার মাথায় বিদ্ধ হল, আর সে লাভ করলো তার প্রতীক্ষিত শাহাদাত। আমরা আল্লাহর কাছে আশা করি তিনি তা কবুল করেছেন। এবং আশা করি তার রূহকে সেই জান্নাতি পাখির ভিতরে ঢোকার অনুমতি দিয়েছেন যা জান্নাতের চতুর্দিকে উড়ে বেড়ায়। তারপর তা আরশ তলে প্রদীপের মাঝে আশ্রয় নেয়।

সুন্দর দোয়া

নাহমী তার দোয়ায় প্রায়ই বলতো: "হে আল্লাহ! আমাদের গুণাহকে আমাদেরকে শাহাদাত দান থেকে আটকে রাখার কারণ বানাবেন না।" আল্লাহ তার দোয়া কবুল করেছেন এবং তার আকাঙ্খায় সাড়া দিয়েছেন, তাই তার আকাঙ্খা পূর্ণ করেছেন।

শহীদ আবু মুসলিম আস সানআনীর পরিবার-পরিজনের প্রতি অসিয়ত:

ভাই বোন ও পরিবার পরিজনের প্রতি-

শুরু করছি আল্লাহর নামে, হামদ ও সালাতের পর। এটা নিজ হাতে লেখা আমার অসিয়ত, আমি এটা লিখছি জুমার দিন ১৪০৯ হিজরীর ১৬ই শাবান।

আমি এটা লিখছি নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস অনুযায়ী। যাতে আছে-

"যদি কোন মুসলিম নিজের কোন জিনিসের বিষয়ে অসিয়ত করে দুই রাত অতিক্রান্ত করে তাহলে তাতে তার কোন অধিকার থাকবে না। তবে যদি অসিয়তটি তার নিকট লিখিত থাকে।"

আল্লাহর বিষয়ে আমি আমার পরিবার-পরিজনকে তাকওয়া এবং তার রাস্তায় জিহাদ করার অসিয়ত করছি। আল্লাহ বলেছেন-

"হে ঐ লোকেরা! যারা ঈমান এনেছো, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং ... এবং তার রাস্তায় জিহাদ করো যাতে তোমরা সফলকাম হও।"

আরো অসিয়ত করছি যেন তারা আল্লাহর রাসুলের হাদীসকে সবসময় খেয়াল রাখে। বিশিষ্ট সাহাবী উবাদাহ ইবনে সামিত রা. থেকে বর্ণিত-

"আমরা রাসুলুল্লাহ সা.-এর কাছে বাইয়াত হয়েছি। আনুগত্যের– সুখের এবং দুঃখের উভয় অবস্থায়; ইচ্ছার বিষয়ে এবং অনিচ্ছার বিষয়ে; এবং আমাদের উপর প্রাধান্যের বিষয়ে এবং আমীরের বিরুদ্ধাচরণ না করার বিষয়ে। তবে যদি এতটাই সুস্পষ্ট কুফরি দেখা যায়, যার পক্ষে আল্লাহর পক্ষ হতে সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। এবং যেখানেই থাকি হক কথা বলার। আল্লাহর পথে কোন নিন্দুকের নিন্দার ভয় করবো না।" [বুখারী, মুসলিম]

আর আল্লাহর পথে আমার মুজাহিদ ভাইদের প্রতি অসিয়ত-

যখন আল্লাহ অনুগ্রহ করে আমাকে শাহাদাত দান করবেন তখন তারা যেন আমাকে আমার শাহাদাতবরণের স্থানেই দাফন করে আর আমাকে যেন পাকিস্তানে না নেয়া হয় এবং আমার কবর যেন যমীন থেকে এক বিঘতও উচু না করে। অবশ্য আমি তো আল্লাহর রাস্তায় আঘাতেরও হকদার না। শাহাদাতবরণ তো দূরের কথা। আর এই অসিয়ত আল্লাহর প্রতি সুধারণাবশত, যেমন আল্লাহ বলেছেন- "আমি আমার বান্দার সুধারণার নিকটেই।"

আর তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট আমানত রেখে যাচ্ছি। যার নিকট কোন আমানত নষ্ট হয় না।

আর আবু আব্দুল্লাহর (উসামা বিন লাদেনের) প্রতি আমার অসিয়ত-

যিনি আরব ভাইদের আমীর তিনি যেন আমার সম্পর্কে কিছু লিখতে নিষেধ করেন 'জিহাদে' হোক কিংবা 'বুনইয়ানে' এবং যেন আমার ছবি ছাপতেও নিষেধ করেন। আর যে তার বিরুদ্ধাচরণ করবে আল্লাহর নিকট আমি তার বিপক্ষে লড়বো।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

বিশেষ পরিবারের সদস্যদের প্রতি-

হামদ ও সালাতের পর-

আমার সম্মানিত পিতা এবং প্রিয় মা এবং আপন ভাই এবং আপন দুই বোন সবাইকেই বলছি।

আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক তার রাস্তায় জিহাদ করা ফরজ করেছেন, যেমন ফরজ করেছেন সালাত, সিয়াম এবং হজ্ব। যেমন ইরাশাদ করেছেন-

"তিনি তোমাদের উপর ফরজ করেছেন লড়াই করা যদিও তা তোমাদের অপছন্দনীয়। অবশ্যই এমন যে তোমরা কোন কিছু অপছন্দ করবে অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জানোনা।"

বহু বছর জিহাদের এই কল্যাণকর পথ বন্ধ থাকার পর আল্লাহর অনুগ্রহ যে তিনি আমাদের জন্য আফগানিস্তানে জিহাদের রাস্তা খুলে দিয়েছেন।

তারপর যখন জিহাদের জন্য মুসলমানদেরকে আহবান করা হলো আল্লাহর শত্রুদের বিরুদ্ধে, যারা কোন স্রষ্টার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করে না সেই নাস্তিকদের বিরুদ্ধে, তখন সৌভাগ্যবানরা এই আহবানে সাড়া দিল।

আল্লাহ সাক্ষী, আমি ইতমিনান এবং সন্তুষ্টচিত্তে এই আফগানিস্তানে এসেছি। এই আশায় যে, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের জন্য আফগানিস্তানে আমার আসার উসিলায় আমার গুণাহ মাফ করে দেবেন।

হে আমার মাতা-পিতা! যখন তোমাদের কাছে আমার শাহাদাতের খবর পৌছবে তখন তোমরা অস্থির হয়োনা। সেটা তো মৃত্যুর নির্ধারিত সময়েই হবে। যা আল্লাহ লিখে রেখেছেন আমি জন্মেরও পূর্বে। যেমন ইরশাদ হয়েছে-

"আর আদেশ করা হয় ফেরেশতাকে তার রিযিকি এবং তার মৃত্যুকাল এবং সে দূর্ভাগা না সৌভাগ্যবান সে জন্মেরও পূর্বে।"

আরো ইরশাদ হয়েছে-

"আর কোন ব্যক্তি জানেনা আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে। আর জানে না কোন ব্যক্তি কোন ভূমিতে সে মারা যাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।"

সাবধান! আল্লাহকে ভয় করো, আল্লাহর তাকদীরে বিরক্তি প্রকাশ করোনা। ভাড়া করে লোক কাঁদানো, জামা-কাপড় ছেড়া, জাহেলিয়্যাতের ক্রন্দনের মত ক্রন্দন এসব যদি করো তাহলে আমি আল্লাহর কাছে এসব থেকে দায়মুক্তি ঘোষণা করছি। যখন খবর পৌছবে তখন খুশি হবে আর দোয়া করবে যেন আল্লাহ আমাকে মুখলিছ শহীদদের মধ্যে কবুল করে নেন। নবীজী বলেছেন-

"(শহীদদের প্রাপ্তির বিষয়ে) শহীদের জন্য আল্লাহর কাছে সাতটি পুরস্কার রয়েছে, রক্তের প্রথম ফোঁটা পড়ার সাথে সাথে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এবং জান্নাতে সে তার আবাসস্থল দেখতে পাবে। এবং কিয়মাতের দিনের

বিরাট দুশ্চিন্তা থেকে বেঁচে যাবে এবং ঈমানের অলংকার পরিধান করানো হবে, এবং আয়তলোচনা বাহাত্তরজন হুরের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে। এবং তার পরিবারের বাহাত্তরজনের বিষয়ে তার সুপারিশ কবুল করা হবে।"

সুতরাং বেশী বেশী আমার জন্য কবুলিয়্যাতের দোয়া করো, যেন আল্লাহ আমার স্বপ্ন পূরণ করেন। আর যদি আল্লাহ আমাকে শহীদদের মধ্যে কবুল করেন এবং তোমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন তাহলে ওয়াদা দিচ্ছি শুরুতেই আব্বা-আম্মা, সন্তানাদি, স্ত্রী, এবং ভাইবোনের বিষয়ে সুপারিশ করবো।

হে আমার মা! আমার শোকে কেঁদোনা, বরং খুশী হও এবং আল্লাহর প্রশংসা করো যে, তোমার সন্তান বিছানায় শুয়ে মৃত্যুবরণ করেনি। আর না গাড়ী চাপা পড়ে বরং সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করেছে যেমন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তামান্না করেছেন আর বলেছেন-

"আমি পছন্দ করি যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করবো তারপর আবার জীবিত হবো তারপর আবার শহীদ হবো।"

সুতরাং আমার জন্য দোয়া করো। আবার বলো না; হায়! যদি আমাদের কাছে থাকতো, আর আফগানিস্তান না যেতো তাহলে তো কিছুই ঘটতো না। এগুলো জায়েয নেই, কেননা মৃত্যুর নির্ধারিত সময় আল্লাহর হাতে, মৃত্যু আল্লাহ যখন ইচ্ছা দান করেন।

হে আল্লাহ! আপনার দ্বীনকে সাহায্য করুন, এবং আপনার কিতাবকে এবং আপনার নবীর সুন্নতকে এবং আপনার মুমিন বান্দাদেরকে সাহায্য করুন। আর আমাদেরকে হে আল্লাহ শহীদদের সাথে কবুল করুন। হে রাব্বুল আলামীন।

সালেহ চাচার প্রতি অসিয়তঃ

আল্লাহ সালেহ চাচাকে হেফাজত করুন এবং তার প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

আসাসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ।

আমি এই চিঠি কিংবা এই অসিয়তগুলি লিখছি বৃষ্টির নীচে বসে। এখন আমি জালালাবাদে একটি অপারেশনে আছি, আজ ১৭ই শাবান শনিবার, প্রথমেই আমি আপনাকে এবং নিজেকে খোদাভীতির অসিয়ত করছি। তারপর তার আদর্শানুযায়ী আমলের তারপর আখেরাতের জন্য পাথেয় গ্রহণের তারপর বেশী বেশী কোরআন তেলাওয়াতের, তারপর বেশী বেশী যিকিরের এবং মসজিদে গিয়ে সময়মত নামাজ আদায়ের এবং রাত্রি জাগরনের এবং আল্লাহর দ্বীনের বিষয়ে তাফাক্কুহ অর্জনের অসিয়ত করছি।

আমার সন্তানের বিষয়ে উত্তম অসিয়ত করছি, তাদেরকে ইসলামী নিয়ম অনুযায়ী প্রতিপালন করবে। তোমাকে আমার স্থলবর্তী নিযুক্ত করলাম। আর আল্লাহ তো আছেনই। সুমাইয়া ও মারইয়াম যখন বড় হবে তখন মুত্তাকী পরহেযগার ব্যক্তির সঙ্গে তাদের বিবাহ দিবে। আর আব্দুর রহমানকে যদি কোরআন হেফজ করতে পার তাহলে ভাল হয়, এর জন্য আল্লাহর কাছে তুমি অগণিত আজর ও সাওয়াব পাবে।

বিদায়! দেখা হবে জান্নাতে আদনে– মহান আল্লাহর নিকট।

স্ত্রীর প্রতি বিশেষ অসিয়তঃ

হে আমার সম্মানিত স্ত্রী! আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ। আমি জানি তুমি ইনশাআল্লাহ অস্থির হয়ে পড়বেনা যখন আমার শাহাদাতের খবর পৌছবে। ইনশাআল্লাহ। কেননা আমার ধারণা তুমি নিশ্চয়ই জানো যে, এটা আল্লাহর পক্ষ হতে ফয়সালা। সুতরাং দোয়া করো যেন আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করেন। আর সুমাইয়া মারইয়াম এবং আব্দুর রহমানের

বিষয়ে কল্যাণের অসিয়ত করছি। সুতরাং তাদের জন্য কষ্ট করো, তাহলে আল্লাহর পক্ষ হতে প্রতিদান পাবে।

তোমাকে আরো অসিয়ত করছি বেশী বেশী কেরআন তেলাওয়াতের, বেশী বেশী যিকিরের, সময়মত নামাজ আদায়ের, রাত্রি জাগরণের, এবং সেসব মজলিস থেকে দূরে থাকার যেগুলোতে গেলে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফলত আসে। আর টেলিভিশন দেখা, রেডিও শুনা এসব থেকে বিরত থাকবে, আর সবসময় এমন কজে ব্যস্ত থাকবে যা তোমাকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সাহায্য করবে।

সম্মানিত স্ত্রী! আল্লাহপাক বলেন-

"আর আল্লাহর হুকুম ছাড়া কেউ মৃত্যুবরণ করতে পারে না। সেজন্য একটা সময় নির্ধারিত আছে।"

"বস্তুত যে লোক দুনিয়ায় বিনিময় কামনা করবে আমি তাকে দুনিয়াতেই দান করব। পক্ষান্তরে যে লোক আখেরাতে বিনিময় কামনা করবে তা থেকে আমি তাকে তাই দেবো। আর কৃতজ্ঞদেরকেও আমি প্রতিদান দান করি।"

সুতরাং আমাদের প্রত্যেকেই শীঘ্রই মৃত্যুবরণ করবো। সুতরাং সৌভাগ্যবান সেই যার শাহাদাত আল্লাহ কবুল করবেন। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি নিয়ে যে দুনিয়া থেকে চলে যাবে। শেষ কথা হচ্ছে, তুমি বেশী বেশী মা-বাবার যিয়ারতে যাওয়ার চেষ্টা করো। এর প্রতিদান তুমি আল্লাহর কাছে পাবে। আর তাদেরকে সান্ত্বনা দিও। যদি আল্লাহ আমার শাহাদাত কবুল করেন তাহলে তো কোন কথাই নেই। আমার মৃত্যু কোন মুসীবত নয়, আর আল্লাহর প্রতি এটাই আমার সুধারণা। আশা করি আল্লাহ জান্নাতে আমাদেরকে একত্র করবেন। এবং তুমি হবে আমার সুপারিশ প্রাপ্তদের একজন।

তোমাকে সেই আল্লাহর কাছে আমানত রেখে দিচ্ছে যার কাছে আমানত নষ্ট হয় না। আর তোমার কাছে মাফ চাচ্ছি।

ইতি: তোমার স্বামী। যে তোমার হক আদায়ে অনেক ত্রুটি করেছে। আল ফাক্বীর ইলাল্লাহ– আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মাদ আন নাহমী (আবু মুসলিম)।

১৬ই শাবান ১৪০৯ ইহজরী মোতাবেক ২৩ ই মার্চ ১৯৮৯ ঈসায়ী।

টিকা: অসিয়ত থেকে মীরাসের বিষয় এবং আরো কিছু ব্যক্তিগত বিষয় অনুল্লেখ রাখা হয়েছে।

আবুল ইউসর (আলী আব্দুল ফাত্তাহ)

(মিশরের মানিয়া জেলার ইসলামী দলের আমীর)

মানিয়ায় এমন কোন ঘর আছে যা তোমার নাম শোনেনি? মানিয়ার এমন কোন যুবক আছে, যে তোমাকে নিয়ে গর্ব করেনি? বাতিল শক্তির এমন কোন সৈন্য আছে যে তোমাকে খুঁজেনি? তুমি কী জাদু দেখালে যে মানিয়ায় এখন আর মদ ও অন্যান্য নেশাকর পানীয়র দেখাই মেলে না? তুমি সেসব খৃষ্টানের ব্যবসার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছো যারা নেশাকর পানীয় বিক্রয় করে ব্যবসা করতো!

আর সেই বিতর্কের কথা আর কী বলবো, যা তোমার আর গ্র্যান্ড মুফতী সাহেব এবং ওয়াক্বফ মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী সাহেবের মাঝে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন তারা সত্যের শক্তির সামনে পরাজিত হয়েছিল। আর সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই বিতর্কের ক্যাসেট এবং ভিডিও এত দ্রুত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে পড়ে যেমন শুকনো ঘাসের মাঝে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেই বিতর্ক বাতিলের ভীতে কম্পন সৃষ্টি করে এখনও।

বিতর্কটি হয়েছিল বড়ই জমজমাট মজলিসে। অনেক মানুষ সেখানে উপস্থিত হয়েছিল। শেষে গ্রাণ্ড মুফতী সাহেব যখন পরাজয় নিশ্চিত বুঝতে পারলো, তখন্ বের হয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলো: "রাষ্ট্রের উচিৎ তোমাদের

সবাইকে হত্যা করা, আমরা আমেরিকা থেকে রুটির মুখাপেক্ষী আর তোমরা বলো জিহাদ করতে!”

ইলমকে এরা কত নিচে নামিয়ে এনেছে? এদেরকে কী করে নবীদের উত্তরাধিকারী বলা যায়? কী হলো তাদের? কেন তারা দুনিয়ার ভোগবস্তুর এত নোংরা নর্দমায় নেমে এসেছে?

তারাই তো ঐ সমস্ত লোক যাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ কোরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ۚ ذَّٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

“আর আপনি তাদেরকে শুনিয়ে দিন সে লোকের অবস্থা যাকে আমি নিজের নিদর্শনসমূহ দান করেছিলাম, অথচ সে তা পরিহার করে বেরিয়ে গেছে। আর তার পেছনে লেগেছে শয়তান, ফলে সে পথভ্রষ্টদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়েছে। অবশ্যই আমি ইচ্ছা করলে তার মর্যদা বাড়িয়ে দিতাম সে সকল নিদর্শনসমূহের দৌলতে। কিন্তু সে অধঃপতিত এবং নিজের উপর অনুগামী হয়ে রইল। সুতরাং তার অবস্থা হল কুকুরের মত যদি তাকে তাড়া কর তবুও হাঁপাবে আর যদি ছেড়ে দাও তবুও হাঁপাবে। এ হল সেসব লোকের উদাহরণ, যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আমার নিদর্শন সমূহকে। অতএব, আপনি বিবৃত করুন এসব কাহিনী, যাতে তারা চিন্তা করে। [সুরা আরাফ: ১৭৫ -১৭৬]

আরো ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ.

"নিশ্চয় যারা গোপন করে ঐ সকল সুস্পষ্ট নিদর্শন এবং হেদায়াতনামা যা আমি নাযিল করেছি মানুষের জন্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করার পরও তাদেরকে অভিসম্পাত করেন আল্লাহ এবং অভিসম্পাত করে অভিসম্পাতকারীরা। তবে যারা তাওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধন করে বর্ণনা করে দেয় সে সমস্ত লোকের তাওবা আমি কবুল করি। আর আমি তাওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। [সুরা বাকারা- ১৫৯, ১৬০]

বিশিষ্ট মুফাসসির কাতাদা ও রাবি বলেন, অভিসম্পাতকারী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ফেরেশতারা এবং মুমিনগণ।

মুজাহিদ ও ইকরিমা বলেন, উদ্দেশ্য হলো, কীটপতঙ্গ এবং চতুষ্পদ জন্তুদেরকে দুর্ভিক্ষ আক্রান্ত করে উলামায়ে সু এর গুণাহের কারণে। যারা আয়াতসমূহ গোপন করে, তখন সেগুলো তাদেরকে অভিসম্পাত করে।

ইবনে মাজাহ বারা ইবনে আযিব থেকে বর্ণনা করেছে এক হাসান রেওয়ায়েতে। নবীজী সা. বলেছেন, (অভিসম্পাতকারী সম্পর্কে): যমীনের পশুরা। (তাফসীর কুরতুবী, দ্বিতীয় খণ্ড- ১৮৬]

কবি বলেন-

"আহলে ইলম যদি ইলমকে হেফাজত করতো
তাহলে ইলমও তাদেরকে হেফাজত করতো।
যদি তারা তাকে মর্যাদা দিতো
তাহলে তাও তাদেরকে মর্যাদা এনে দিতো।
কিন্তু তারা ইলমকে অপমান করেছে এবং কলঙ্কিত করেছে,
লোভ দ্বারা; তাই তারাও অপমানিত হয়েছে।

এই লোকের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনলাম

এই বিতর্কের পর মানুষের মাঝে শায়খ আলী আব্দুল ফাত্তাহের প্রসিদ্ধি ছড়িয়ে পড়ল। আর মানুষ তার পাশে জড়ো হয়ে বলতে লাগল, আমরা এই লোকের রবের প্রতি ঈমান আনলাম।

আত্মগোপন

এ সময় সরকার দেখল, তাকে রিমাণ্ডে অথবা কিছু সময় জেলে পাঠানো উচিৎ। তাই তারা হন্যে হয়ে তাকে খুঁজতে লাগলো। এমনকি যার সাথে তার সামান্য সম্পর্ক ছিল তাকেও বন্দি করতে লাগলো। শেষে তারা প্রায় পাঁচশ মানুষকে আটক করেছে কিন্তু কোনোভাবেই তাকে আটক করা সম্ভব হলো না। আইন মন্ত্রণালয় একের পর এক চারজনকে বরখাস্ত করেছে তাকে না ধরতে পারার কারণে।

বিরোধী পত্রিকাগুলো সরকারকে উপহাস করতে লাগলো তাকে ধরতে না পারার ব্যর্থতার কারণে। আর তিনি প্রায় ছয়মাস রাতে ঘুমাননি এই আশঙ্কায় যে, পুলিশ তখনই হানা দিতে পারে।

এক খৃষ্টান তাকে আশ্রয় দিলো

যে এলাকায় তিনি আত্মগোপন করেছিলেন সেখানে এক রাতে পুলিশ তল্লাশি শুরু করল। তখন তিনি পালানোর জন্য পাশের বাড়ির ছাদে লাফ দিলেন, ছাদে একটা গর্ত দেখে তা থেকে নামতে চইলেন। এমন সময় বাড়ীর মালিক একটি চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললো: এখানেই আত্মগোপন করুন হে শায়খ আলী! লক্ষ্য করলেন যে এটি একজন খৃষ্টানের বাড়ী, খৃষ্টান ব্যক্তি তাকে আশ্বস্ত করলেন যে, এখানে তার ধরা পড়ার কোন আশংকা

নেই। ঠিকই, পুলিশ সারা এলাকায় তল্লাশি চালাল শুধু এই ঘর ছাড়া। সম্ভবত এ কারণে যে, এই বাড়ীর মালিক মুসলমান নয়।

শরাবখানা

একবার শায়খ আলী খবর পেলেন যে দুটি মদ ভর্তি ট্রাক মানিয়ার দিকে আসছে। তখন তিনি তার সঙ্গীদের নিয়ে এক জায়গায় ওঁৎ পেতে রইলেন। তারপর যখন সেগুলো তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করতে যাচ্ছিল তখন সেগুলোকে থামালেন এবং একটা একটা করে মদের বোতল ভাঙ্গতে লাগলেন। যখন ফজর হয় তখন সব ভাঙ্গা শেষ হয়ে গেল। তারপর তারা শরাবখানায় হানা দিলেন। এরপর থেকে সাধারণ মানুষরা তার গোয়েন্দায় পরিণত হলো। যখনই কোথাও তারা এসব দেখতো তখনই তাকে খবর দিতো আর তিনি সেগুলোর উপর হামলা চালাতেন।

শায়খ আলী ও তার সঙ্গীরা কিছু মসজিদ তাদের দায়িত্বে নিয়ে সেখান থেকে খেলাফতের কার্যক্রম পরিচালনা করতে লাগলেন। মানুষেরও তাদের প্রতি আস্থা ছিল। তাই তারাও তাদের যাকাত ও ফিতরা তাদের কাছে পরিশোধ করতে লাগলো। তারা ট্রাকে করে ভালো খাদ্য সামগ্রী এবং পোষাক-আশাক নিয়ে দরিদ্রদের বাড়ী বাড়ী দিয়ে আসতো। কতবার সরকার এসব বাজেয়াপ্ত করেছে এবং তাদেরকে আটক করেছে তার ইয়ত্তা নেই।

অবশেষে এক পর্যায়ে তিনি জিহাদের ভূমি আফগানিস্তানে চলে আসলেন, এবং নিজেকে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত করতে লাগলেন। এক জুমায় তিনি খুতবা দিলেন। খুতবার পরে আমার পাশে এসে বসলেন। একটা বাক্য খোতবার সময়ই আমার ভাল লেগেছিল। তাই সেই বাক্য শোনার পর থেকেই আমি তাকে না চিনেও ভালবেসে ফেললাম। তারপর আবার তিনি মিশরে ফিরে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য সকল পথ রুদ্ধ করে দেয়া হলো। তাই জর্দান দিয়ে তার পরিবারকে নিয়ে এলেন এবং আফগানিস্তানে ফিরে গেলেন।

যখনই শায়খ আলী আব্দুল্লাহ আন নাহমীর কবরের পাশ দিয়ে যেতেন তখনই বলতেন, “ধন্য হে আবু মুসলিম! (আস সানআনী) তোমার অবস্থানের প্রতি ঈর্ষা জাগে, হায় যদি আমি তোমার পাশেই দাফন হতাম!” শায়খ আলী তাকে খুবই ভালবাসতেন। আসলে তিনি যেন তার ভাগ্যলিপিকে দেখতে পেতেন। কারণ আবু মুসলিম দাফন হয়েছেন জালালাবাদের কাছে। বিগত পনেরই শাবান শাহাদাত বরণের পর। আর ছয়ই রমাযান ১৪০৯ হিজরীতে আবুল ইউসর শাহাদাতবরণ করলেন।

ঘটনা এই যে, তিনি খন্দকের পাশেই ছিলেন। আর প্রায়ই তিনি তার সঙ্গীদেরকে এই আয়াত দ্বারা উপদেশ দিতেন-

“হে ঐ লোকেরা যারা ঈমান এনেছো! আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশ মান্য করো। যখন তোমদের সে কাজের প্রতি আহবান করা হয় যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন।”

আবার কখনো ইবনুল কায়্যিমের সেই কথা স্মরণ করাতেন, “জিহাদ ছাড়া তো যিন্দেগী কল্পনাও করতে পারিনা।”

এমনই একদিন কোরআন তেলাওয়াতের অবস্থায় হাউন গোলা এসে পড়ল আর কিছু শেল তাকে বিদ্ধ করল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি শাহাদাতবরণ করলেন। তার সঙ্গীরা ছিল খন্দকে, কিছুক্ষণ পর তারা টের পেলো আবু ইউসর তাদের সঙ্গে নেই। তখন খুঁজতে বের হয়ে দেখলো তিনি শাহাদাত বরণ করেছেন। এভাবেই তিনি মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে বড় শাহাদাত লাভ করলেন সেই শাহাদাত (সার্টিফিকেট) নয় যা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাওয়া যায়।

তিনি চলে গেলেন। তার শাহদাতবরণে দুনিয়া কেঁপে উঠেছে।

শান্তি বর্ষিত হোক তার উপর যেদিন তিনি এগিয়ে এসেছেন আর মানুষ পিছিয়ে গেছে। যেদিন তিনি কোরবান করেছেন আর মানুষ ভীরু হয়ে গেছে। যেদিন তিনি নিজেকে সপে দিয়েছেন জিহাদের জন্য আর মানুষ কৃপণতা করেছে।

তিনিই সাহসী, কৃপণতাকে মনে করেন ভীরুতা,
তিনিই দানশীল, ভীরুতাকে মনে করেন কৃপণতা।
প্রতিটি চোখ তোমার দানশীলতা দেখেছে,
প্রতিটি তরবারী তোমার সাহসিকতা দেখেছে।

শায়খ আলী কবিও ছিলেন, জেলে থাকাবস্থায় পবিত্রভূমি কুদসকে নিয়ে একটি সুন্দর নাশীদ রচনা করেছিলেন। এবং সেটাকে সুন্দর সুরও দিয়েছিলেন। আমি মিশর যুবকদেরকে তা গাইতে শুনেছি। নাশীদটির নাম "লাব্বাইক হে প্রিয় কুদস! আমরাই পবিত্রভূমির জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করবো।"

আফগান-জনতার প্রতি বিদায়ী কথা

নিম্নোক্ত বাক্যগুলো দ্বারা তিনি এই আফগান জনতাকে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছেন-

আমার হৃদয় তোমাদের ভালবাসায় আর এই খন্দক ও বন্দুকের ভালোবাসায় পরিপূর্ণ। এটা ঠিক যে, তোমরা আলুথালু বেশধারী, ধুলোমলিন। কিন্তু তোমাদের হৃদয় খুবই নরম। আর সেটাই রহমানের কাছে প্রিয়।

হে আমার প্রিয় ভাইয়েরা! সীমান্তরক্ষীরা! তোমরা ভুলে যেওনা, তোমাদেরকে কারা স্মরণ করে? তোমাদেরকে স্মরণ করে দুর্বল নির্যাতিতরা। আর চিৎকার করে সাহায্য চায়। যখন ইয়াতিম শিশু তার শোকগ্রস্ত মাকে তার বাবার সম্পর্কে বারবার জিজ্ঞাসা করে আর বলতে থাকে, কখন বাবা আসবে? কখন আমরা চলে যাবো? তখন তোমরাই তাদের আশা-ভরসা, তোমরাই তখন ক্রুদ্ধ সিংহ। যখন রাতের অন্ধকার বাড়তে থাকে এবং দীর্ঘ হয় তখন তোমাদের ক্রুদ্ধ ললাটেই ভোর উঁকি দেয়।

اللّٰهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“আল্লাহ অবশ্যই তার নূরকে পূর্ণতা বিধান করবেন। যদিও কাফেররা অপ্রীতিকর মনে করে।” [সুরা তাওবা- ৩২]

আল্লাহর কাছে আমাদের আশা, আমাদেরকে তিনি ফেরদাউসে একত্র করবেন।

মুহাজির শায়খ (আব্দুশ শায়খ মুহাম্মাদ)

বড় বড় দাঈদের সকলে ইন্তেকাল করেছে। জামাতের বড় বড় ব্যক্তিরা একই মাসে আপন রবের সান্নিধ্যে চলে গেছেন। জালালবাদ যেন শোকাগ্রস্ত হয়ে বলছে, ঈমানের আগুন প্রজ্বলনের আর কোন জ্বালানি কি বাকী আছে? হে নিঙ্গাহারের ভূমি, তুমি কি সেই পবিত্র রক্ত দেখোনি? যেই পবিত্র দেহ তুমি গিলেছো তা কি যথেষ্ট হয়নি? হয়েছে, যথেষ্ট হয়েছে! তুমি তো কলিজার টুকরাগুলো এবং হৃদস্পন্দনগুলো গিলেই নিয়েছো!

প্রথমে আবু মুসলিম গেলেন, তারপর গেলেন আবদি, আবদির শাহাদাতের একদিন পরই মৃত্যুদূত তৃতীয় নেতাকেই নিয়ে গেলো, আবুল ইউসরও (আলী আব্দুল ফাত্তাহ) চলে গেলেন।

কত চোখ তোমার জন্য অশ্রুপাত করবে? কত ভূমি তোমার জন্য ইস্তেগফার করবে? বেলুচিস্তান তোমার জন্মভূমি নাকি কুয়েত যে ভূমিতে তুমি নেমেছো এবং যার আলো বাতাসে তুমি বেড়ে উঠেছো? নাকি কাতার যার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট লাভ করেছো? কে জানে, এই যুবক কুয়েতের ঈমান একাডেমীতে শিক্ষালাভ করেছে? আর কাতারে শরীয়া অনুষদ থেকে সার্টিফিকেট নিয়েছে। কেউ কি কখনো এমন শুনেছে?

যারা তোমাকে দেখেছে তারা অবশ্যই তোমার শোকে কাঁদবে। যারা তোমার কথা শুনেছে তারা অবশ্যই তোমার উত্তম প্রশংসা করবে।

এভাবেই আল্লাহ তোমার ভাগ্যে উপসাগরীয় এলাকায় এত সফর দিয়ে রেখেছেন। তাই বহু মানুষ তোমাকে চিনে, হয়তো আল্লাহ মৃত অন্তরগুলোকে তোমার মাধ্যমে জীবিত করবেন, হয়তো ভ্রষ্টতার পথগুলো থেকে তাদেরকে তিনি উদ্ধার করবেন, তোমার মাধ্যমে।

শিক্ষাজীবন

১৯৮৫ তে কাতারে শরীয়া অনুষদে ভর্তি হলেন, সে বছরই শিক্ষা শেষ করে সার্টিফিকেট লাভ করলেন, তখন তার বয়স ২৪ বছর। তারপর বিভিন্ন মাদরাসায় তাদরীসের খেদমত করলেন। কিন্তু বসে বসে এসির বাতাস খাওয়া তার ভাল লাগলোনা। যখন তারই মুসলিম ভাইয়েরা গুলিবৃষ্টির মধ্যে দিন কাটায়। আর পেশওয়ারে ১০০ ডিগ্রীর উপরে গরমে মুসলিম শিশু আর্তনাদ করতে করতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। সিংহ কি চিড়িয়াখানায় খাঁচাবন্দী হয়ে মানুষের তামাশা দেখতে পারে? অবশ্যই সে শিকল মুক্ত হয়ে গহীন বনে ছুটে আসবে যেখানে বিশাল বিশাল হিংস্র প্রাণী তার সাথে লড়াইয়ের জন্য অপেক্ষা করছে।

১৯৮৭ ঈসায়ীতে আবদি বিয়ে করে জিহাদের ভূমিতে হিজরত করলেন। তার আগেই তারই আপন ভাই যাহিদ (লাজনাতুদ দাওয়াহর পরিচালক) এবং খালিদ (আমেরিকা থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং সার্টিফিকেট লাভকারী) হিজরত করেছেন। আবদি এসেই শায়খ সাইয়াফের সাথে সর্বদা ছায়ার মত লেগে থাকলেন।

তারপর যখন জিহাদের মিষ্টতা আস্বাদন করলেন তখন তিনি তার মাশায়েখদের কাছে সুন্দর এক ভর্ৎসনা পত্র লিখলেন। চিঠিটির শুরু ছিল এমন পূর্ণ আদবের সাথে–

"প্রথমেই ক্ষমা প্রার্থনা করছি শায়খের কাছে, আপনার নিকট আমার এই পত্র আবেগ ভালবাসায় পরিপূর্ণ। সুতরাং ভুল হলে ক্ষমাপ্রার্থী। ..."

শায়খ সাইয়াফ সাধারণত বিভিন্ন জায়গায় ভীষণ যুদ্ধের সময় ছুটে যেতেন, তার সাথে ছায়ার মত লেগে থাকতেন আবদি আর তার ভাই খালিদ। যাহিদ কখনও কখনও যেতো। আমি আমার ক্যাম্পে দশ-বারো দিন খালিদের সোহবত পেয়েছিলাম। আমি তাকে সেক্রেটারী বলে ডাকতাম, সে সময় আমরা সাহাবীদের পদ্ধতি অনুসারে তেলাওয়াত জারী করেছিলাম। এক সপ্তাহে এক খতম। প্রথম দিন ফাতেহা থেকে মায়িদাহ, দ্বিতীয় দিন মায়িদাহ থেকে ইউনুস; তৃতীয় দিন ইউনুস থেকে বনী ইসরাঈল; চতুর্থ দিন ইসরা থেকে শুআরা; পঞ্চম দিন শুয়ারা থেকে সাফফাত; ষষ্ঠ দিন সাফফাত থেকে ক্বফ পর্যন্ত; সপ্তম দিন সাফফাত থেকে সুরা নাস পর্যন্ত। এ সময় খালেদ খুব মনোযোগের সাথে তেলাওয়াত শ্রবণ করতো।

শাহাদাতবরণ

আবদি, আবুল ফজল, আবু তারিক (আল ইয়মানী) উসামা আল আযবাকী, সখর আস সকেরী, সুরাকাহ আশ-শারক্বাউয়ী– এই পাঁচজন বিমানবন্দরে হামলার জন্য জালালাবদে গিয়েছিল। আরবরা চেয়েছিল অগ্রসেনানী হিসাবে যেতে। কিন্তু সেনাপতি খালিদ (যে এক পাশ দিয়ে সৈন্য পরিচালনা করে) বললেন, আরবরা সবার শেষে যাবে যাতে কোনভাবেই তারা আক্রান্ত না হয়। আদেশানুযায়ী প্রথমে পঞ্চাশজন আগান গেল, তারপর বীরা গেল। তারপর একই পথেই সেই পাঁচজন গেল, কিন্তু সতর্কতা তাকদীরের ফায়সালাকে রোধ করতে পারে না। তো পথ চলতে চলতে হঠাৎ ছখরের পা মাঈনের তারে পেঁচিয়ে গেলে। যার সাথে কয়েকটি মাইনের সংযোগ ছিল। ফলে মাইনগুলো বিস্ফোরিত হলো। সাথে সাথে আবদি শাহাদতবরণ করলো। ওসামা ছাড়া বাকী সবাই আহত হলো।

সবাই তো এখানেই জন্মেছিল + কাউকে তো এমন দেখলাম না।
এমনই যখন হয়েছো তুমি + তীর-তলোয়ার আর কোন জায়গা পাবে না।

তিন আহত আবু তরিক, মুরাক্কাহ, ছখরকে হাসপাতলে নিয়ে যাওয়া হল। আর আবদি ও আবুল যেহেতু শাহাদতবরণ করেছিল সেহেতু তাদের দুজনকে নিঙ্গাহারে (জালালাবাদ) দাফন করা হল। আবু তারিককে ফাওয়ান হাসপাতালে নেয়া হয়েছিলো। তখন তার অবস্থা ছিল গুরুতর, পায়ের গোছা এবং হাত ছিল ছিন্নভিন্ন অবস্থায়। তাকে যখন হাসপাতালে আনা হয় তখন আমি হাসপাতালে উপস্থিত ছিলাম।

ধৈর্যের অনন্য দৃশ্য

যেই বেডে আবু তারিক ছিল তার পাশে একদিন আমরা কয়েকজন ডাক্তারসহ বসে ছিলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম- তোমার কী হয়েছে? সে বলল আমাদের নিকটেই মাইন বিস্ফোরিত হয়েছে, তখন আবদি শহীদ হয়ে গেছে। আমি বললাম, আবদি কে? সে বলল, যার মূল ভূমি বেলুচিস্তান। বেড়ে উঠেছে কুয়েতে। সেখানে আট বছর আপন ভাই যাহিদও উপস্থিত ছিল। আমি দেখলাম যাহিদের মুখে বেদনার চিহ্ন। চোখে অশ্রু। সে বলে উঠল, তুমি কি নিজের চোখে আবদিকে শাহাদতবরণ করতে দেখেছে? সে বলল, হ্যাঁ... সে সাথে সাথেই আমার সামনে শাহাদাতবরণ করেছে। তখনও যাহিদের মুখে ধৈর্যের ছাপ ছিল স্পষ্ট। আল্লাহর নবী সত্যই বলেছেন, আল্লাহ পাক মুছীবতের পরিমাণ অনুযায়ী ধৈর্য নাযিল করেন।

শুহাদায়ে কেরামের কবরগাহে

পরের দিনই ৬ রমাযান মঙ্গলবার এক বাহনে করে আবদির জানাযা পড়িয়ে দেয়া হয়েছে। তখন শায়খ সাইয়্যাফ মুহাম্মাদ ইয়াসির কান্নায় ভেঙ্গে পড়েছিলেন। কবরগাহ তখন আরব ও আফগানী মুজাহিদে ভর্তি। এভাবেই আমাদের মাঝ থেকে বিদায় নিলেন আবদি। রেখে গেছেন তার স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তানের একজন। নাম- সুহাইব।

তিনি চলে গেলেন, আমাদের হৃদয় আজো তার স্মরণে কাঁদে, আল্লাহ আবার আমাদেরকে সালেহীনদের সঙ্গে একত্র করুন। আমীন।

মুজাহিদ ঘাঁটির সেই বিলাল মুহাম্মাদ খালাফ আস-সখরী

তার জন্ম ও বেড়ে উঠা তায়েফে। আবু আব্দুল্লাহ (উসামা বিন লাদেন) যখন আনছারদের ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা শুরু করেছেন তখন তার রাহে এলো এক যুবক। তার নাম আবু হানীফা, উসামা তাকে দেখে খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাকে দাঈ বানিয়ে পাঠালেন। সে তায়েফেই থাকতো, তাই তার প্রথম দাওয়াতের টার্গেট ছিল তায়েফের যুবকরা, তো যখন একদল যুবকের সামনে সে তার আলোচনা তুলে ধরল তখন তারা তার আহ্বানে সাড়া দিল। তাদের মধ্যেই ছিল এই বিলাল।

উসামা যখন ঘাঁটি তৈরী করছিলেন তখন মেহনত করতে হয়েছিলো। তখন ছিল শীতকাল। পাহাড়গুলো বরফে ঢাকা পড়ে যেতো। ভর দুপুরে সূর্যের তীক্ষ্ণ আলোতেও বের হওয়া যেতোনা। কারণ সূর্যের চেয়ে পরিবেশের শীতলতা ছিল প্রচণ্ড বেশী।

মদীনা শরীফে ইস্তিখারা

বেলাল মদীনা শরীফে দুই রাকআত নামায পড়ে ইস্তিখারা করল। ইস্তাখারায় যাওয়ার দিকেই মন ঝুঁকলো। বিলাল পড়ালেখা করতো মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের শরীয়া অনুষদে। সেখান থেকে আমার ক্যাম্প ছিলো অনেক দূরে। পথে বিভিন্ন বিরূপ পরিস্থিতিরও সম্মুখীন হতে হয়। আর খাওয়া-দাওয়ার কষ্ট তো ছিলোই। তাই শুরুতে বিলালের খুবই কষ্ট হচ্ছিলো, একেতো সে যে যুবকদের সাথে ছিল তারা সবাই ছিলো নতুন। তাদের এখনও তেমন উন্নতি হয়নি। আবার পারিপার্শ্বিক কিছু কষ্টও ছিল। তাই বেলাল ঘাঁটি ছেড়ে তায়েফ গেল। কিন্তু কোথায় জীবনের স্বাদ? সেটা কি

এক টুকরো গোশতের মাঝে পাওয়া যায়? কিংবা ফুল স্পীডে গাড়ী চালানোর মাঝে? কিংবা বন্ধুবান্ধবদের সাথে ঘোরা ফেরায়? জীবনের স্বাদ তো কষ্টসহিষ্ণু জিহাদী জীবনেই আছে।

ফলে জীবন তার নিকট দূর্বিষহ হয়ে উঠতে লাগলো। যেন জীবনটাই বিষাদ। কোথায় ইসলামের চূড়া জিহাদী জীবন, আর কোথায় সুখে-স্বাচ্ছন্দে বসে সাথীদের সঙ্গে ইসলামী বই পড়া? এ যেন একজনের মধু খাওয়া আর অন্যজনের মধুর উপকারিতা সম্পর্কে বই-পত্র পড়ার মত। দ্বিতীয়জন মধুর স্বাদ ও ঘ্রাণ পাবে?

তাই একসময় বেলাল আবার ঘাঁটিতে ফিরে এল। এতদিনে আরব যুবকের সংখ্যাও বেড়েছে, তাদের চরিত্রেরও অনেক উন্নতি হয়েছে। তাই সে তাদের সঙ্গে মিশে যেতে পারল। পথে ঘাঁটে অনেক সময় বিভিন্ন পেরেশানীর সম্মুখীন হতে হতো। আমরা সাধারণত আফগানী পোশাক পরে বের হতাম যাতে বোঝা না যায় যে, আমরা আরব। বিভিন্ন শব্দ শিখতাম, যাতে পাকিস্তানী পুলিশ মনে করে আমরা আফগানী। কারণ পাকিস্তানী পুলিশ জানতে পারলে খুবই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কারণ তাদের পেছনে মূলত কলকাঠি নাড়ে ইহুদী চক্র আর আমেরিকা যারা কখনোই চায়না যে আফগানিস্তানে জিহাদের সুন্নত (বর্তমানে ফরজ) যিন্দা হয়ে উঠুক।

এভাবে দুই বছর আমাদেরকে খুব কষ্টে কাটাতে হয়েছে। প্রতিটি চেকপোষ্ট পার হতে আমাদের ঘাম ঝরে হতো। আর যদি চেকপোষ্টের অফিসার শিয়া অথবা সমাজতান্ত্রিক অথবা জাতিয়তাবদী অথবা দ্বীনি মহলের বাইরের লোক হতো তাহলে তো সমস্যা আরো বেড়ে যেতো। এক ঝড় থামতেই আরব দূতাবাসগুলো আরেক ঝড় উসকে দিতো। তাই আমরা মাইলের পর মাইল পাহাড় দিয়ে অতিক্রম করতাম। যাতে চেকপোষ্টের সম্মুখীন না হতে হয়।

তুলনামূলক পর্যালোচনা

আমি দেখেছি, ফ্রান্সের কিংবা আমেরিকার যুবক স্বাচ্ছন্দে চেকপোষ্টের সামনে দিয়ে চলে যেতো। কেউ কিছুই বলতো না, যদি সামান্য সমস্যা হতো তাদের কিয়ামত কায়েম হয়ে যেতো। তাদের দূতাবাসগুলো পাকিস্তানের দূতাবাসকে বিভিন্ন হুকমী-ধমকী শুনিয়ে দিতো। তারপর রাষ্ট্রীয় এবং অন্যান্য বৈঠকে রাষ্ট্রদূতরা এর কড়া প্রতিবাদ জানাতো। তখন ছিলো তাদের দূতাবাসগুলোর কর্তব্যবোধ। আর আরব দূতাবাসগুলোর কাজ ছিলো যেভাবেই পারুক আমাদেরকে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে নিক্ষেপ করা। সাথে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ তো ছিলই।

বিলালের দোয়া

বিলাল যতই নিজেকে লুকানোর চেষ্টা করতো কিন্তু তার গায়ের রঙ-ই বলে দিতো সে আরব। যখন ভীষণ সমস্যা হতো এমনকি তাকে যেতে দেয়া হতো না তখন বেলাল দোয়া করতো, "হে আল্লাহ! আপনি সুদান ও সোমালিয়ার মত কোন অঞ্চলে জিহাদের ব্যবস্থা করুন। যেখানে কালো ভাইয়েরা বাস করে। তখন তাদের সঙ্গে জিহাদে শরীক হবো। তারপর সেখানে যখন আমার আরব ভাইয়েরা আসবে তখন বুঝবে এভাবে যেতে না পারা কত কষ্টের।"

কান্দাহারে

শেষ পর্যন্ত বিলাল কান্দাহারে পৌছতে পেরেছিলো। সেখানের আবহাওয়া হলো তপ্ত লোহা কিংবা বলা যায় আগুনের ফুলকির মত, প্রচণ্ড গরম। সেখানে কিছুদিন থেকে আবার ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে।

শেষ যাত্রা

জালালাবাদ বিমানবন্দরের নিকটে এক অপারেশনে বেলাল তার অন্যান্য সাথী আবদি, উসামা (আল আযবাকী), সুরাকাহ এবং আবুল ফযল (আল ইয়ামানীর) সঙ্গে যাচ্ছিলো। খালিদ (ইউনুস খালিসের সংগঠনের একজন সেনাপতি) বলেছিলো, আর যারা সফর শেষে যাবে, তাদের আগে পঞ্চাশজন আফগানী যাবে। তো যাওয়ার পথে মাইনের তারে বিলালের (তার নাম সখর) পা বেঁধে মাইন বিস্ফোরিত হয়। এই বিস্ফোরণের ফলে শেষ পর্যন্ত তিনজন শাহাদাত বরণ করে (আবদি, সুরাকা, বিলাল ওরফে সখর)। আর আবুল ফযলের পা ভেঙ্গে যায়। এভাবেই বিলাল মহান প্রভুর সান্নিধ্যে গমন করে। আমরা আল্লাহর কাছে আশা রাখি। তিনি আমাদের সবাইকে সালেহীনদের সঙ্গে কবুল করবেন।

তোমার জন্য প্রাণোৎসর্গ করেছে প্রশিক্ষিত ঘোড়া,

তোমার জন্য প্রাণোৎসর্গ করেছে খোলা তরবারি।

কিছু শিক্ষণীয় ঘটনা ...

ক. অপেক্ষমান আয়তলোচনা হুর

একদিনের ঘটনা। আমার এক ভাইয়ের বন্ধু। যে একদিন তার গাড়িতে করে আমাদের বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিল। আমি আমার ভাইকে জিজ্ঞাসা করলাম তোমার বন্ধুর খবর কী? যে তার গাড়িতে করে আমাদের পৌঁছে দিয়েছিল। অনেক দিন হল তার কোন সংবাদ পাই না। সে আশ্চর্য হয়ে বলল, তুমি কি তার কোন সংবাদ জানো না?

তখন সে বলতে শুরু করল, সে ছিল এমন যুবক, যার বাপ-দাদাদের আল্লাহ তায়ালা প্রচুর ধন-সম্পদ ও সম্মান-মর্যাদা দিয়েছিল, কিন্তু সে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও নিয়ামত দাতার শুকরিয়া আদায় করত না। অযথা কাজে ব্যয় করত। যেমনটা বর্তমান যামানার অধিকাংশ যুবকদের অবস্থা।

একদিন সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল। ইমাম না থাকলে আপনি কেন নামায পড়ান। এবং একটু কঠোর ভাষায় বলল, আপনার পরিবর্তে আমি কি নামায পড়াতে পারি না? এরপর সে বলল, আমি কিন্তু আপনার অনুভূতিতে আঘাত করতে চাইনি। তখন আমি তাকে বললাম, দোস্ত ইমামতি একটা স্পর্শকাতর বিষয়। সবাই তা যথাযথভাবে আদায় করতে পারে না। আর মুসলমানদের ইমামতির জন্য তোমার তো কুরআন মুখস্থ করা প্রয়োজন। এই কথায় সে প্রভাবান্বিত হয়ে চলে গেল।

তখন থেকেই তার মাঝে পরিবর্তন উপলব্ধি করতে লাগলাম। আমি ধারনা করলাম এটা কয়েকদিন থাকবে। পরে আগের মতই হয়ে যাবে। কিন্তু কয়েকদিন পরে এসে আমাকে জানাল সে পাঁচ পারা মুখস্থ করে ফেলেছে। আবার কয়েকদিন পর জানাল সাত পারা মুখস্থ করে ফেলেছে। পরিশেষে একদিন কুরআন শরিফ আমার হাতে দিয়ে বলল, তোমার যেখান থেকে ইচ্ছা প্রশ্ন কর!! এমনকি কুরআন হেফয করার কয়েকদিন পর বিভিন্ন মসজিদ থেকে নামায পড়ানোর জন্য তাকে আমন্ত্রণ জানাতে লাগল। কারণ তার কণ্ঠ ছিল বেশ চমৎকার ও সুমধুর। কিন্তু সে তা গ্রহণ করল না।

লেখাপড়া শেষ করতে মদীনায় চলে গেল। কিন্তু একটা মসজিদের লোকেরা তার থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিল। সে রমযানে তাদের মসজিদে তারাবীহ পড়াবে। এরপর থেকে বেশ কিছু দিন আমার থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল।

এরপর হঠাৎ একদিন সংবাদ আসল, তাকে আইসিওতে রাখা হয়েছে। আর সবাই তার খবর জানতে চাইল। কয়েকজন যুবক তার কাছে গেল। যারা তাকে চিনত তারা সেখানে তাকে সালাম দিয়ে ঢুকল। কিন্তু এতক্ষণে পরস্পরের দূরত্ব বহুদূরের। তারা লোকদের কাছে এসবের কারণ জিজ্ঞাসা করল। লোকেরা তাদের জানালো, কিছুদিন আগে তার নেককার বন্ধুদের সাথে পিকনিকে গিয়েছিল এবং সন্ধ্যায় যখন ঘুমানোর জন্য তাবুতে ঢুকল তখন বন্ধুরা বিবাহ শাদি বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিলো। তাদের একজন তাকে বলল দোস্ত তুমি মনে হয় বিয়ের প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছো। তখন সে বলেছিল দুনিয়ায় এমন কিছু এখনো হয়নি। তবে ইনশাআল্লাহ আশা রাখি হুরদের সাথে হবে। এরপর আলোচনা শেষ।

সবাই নিরাপদে ঘুমিয়ে পড়ল। আর সে কিছু নামায ও কুরআন তিলাওয়াতের পর ঘুমাল। তখন ছিল শীতকাল। আবহাওয়া বেশ ঠাণ্ডা। তাই একজন শেষ রাতে পানি গরম করতে উঠল। এবং গ্যাস ধরানোর জন্য অনেক চেষ্টা করল। পরিশেষে ব্যর্থ হল। তখন হঠাৎ এই ব্যর্থ চেষ্টায় গ্যাসের বোতলের মুখে বিরাট আকৃতির আগুন জ্বলে উঠল। এই অবস্থায় তার মস্তিষ্ক নিস্তেজ হয়ে গেল। বুঝতে পারছেনা এখন সে কি করবে। তখন সে বোতলটাকে তাবুর দরজার দিকে নিক্ষেপ করল। যাতে করে বন্ধুরা আক্রান্ত না হয়। কিন্তু তা কয়েকজন যুবকের উপর গিয়ে পড়ল। যাদের মাঝে আমাদের এই বন্ধুও ছিল। আর সেই সবচেয়ে বেশী আক্রান্ত হয়েছিল। তখন তাকে হাসপাতালের আইসিওতে রাখা হয়েছিল। সেখানে অনেকেই তার সাথে সাক্ষাত করেছিল। কিন্তু তখনও তার কোন অনুভূতি ছিল না। কিন্তু তিনদিন পর্যন্ত তার শাহাদাত আঙ্গুলি আসমানের দিকে উঠানো ছিল। এইসময়ে ও কারো সাথে কোন কথা বলেনি। যেন সে দুনিয়া ও তার চাকচিক্যককে বিদায় জানাচ্ছে এবং পর্দার পিছনের হুরদের অপেক্ষা করছে। যারা গতরাত থেকেই তার অপেক্ষা করছে। ইনশাআল্লাহ।

খ. ঢেউয়ের কল্যাণে তাওবা

এক যুবক। সমুদ্র-উপভোগ তার খুব প্রিয়। তাই সমুদ্রে দীর্ঘ সময় কাটানোর জন্য সে একটি নৌকা কিনল। কারণ সমুদ্র-তরঙ্গ তার কাছে সপ্নীল গানের মত হয়ে উঠল যা তার শুনতেই মনে চায়। একবার সে তার বন্ধুদের সাথে সেই সমুদ্রে বিনোদন করেছিল। আল্লাহ তায়ালা এই যুবকের কল্যাণ চাইলেন, ফলে ঘটে গেল এক আকস্মিক ঘটনা।

ঘটনাটি নিজের মুখেই ব্যক্ত করে সে এভাবে...

একদিন আমি আমার নৌকাসহ সমুদ্রে ছিলাম। ঢেউয়ের পর ঢেউ অতিক্রম করছিলাম। সূর্য ডুবি ডুবি করছে, আমি আরও কিছু সময় সেখানে একাকী কাটাতে চাইলাম। আমার সপ্নীল ভূবনে, সুন্দর এই সময়টা পার করবো কল্পনার জগতে বিচরণ করে। আমি নীলাভ পানিতে একাকী, হঠাৎ এক কল্পনাতীত ঘটনার সুত্রপাত; নৌকা আমাকে উপরে তুলছে আর নীচে আঁছড়ে ফেলছে। পানিতে আমি মৃত্যুভয়ে ঢেউয়ের সাথে সংগ্রাম করে যাচ্ছিলাম। তখন আমি "লাইফবোট" বা এ ধরনের অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কোন প্রস্তুতকৃত রশি বা এ ধরণের কিছুই পেলাম না। চিৎকার করে উঠলাম, "হে আল্লাহ! আমায় মুক্তি দাও" অন্তরের গহীন থেকেই আসছিল এই চিৎকার। সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম।...

কিছুক্ষণ পর সম্ভিত ফিরে আসল! জাগ্রত হলাম। ডানে-বামে চক্ষু ফিরিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখতে পেলাম 'অনেক লোক' তারা বলাবলি করছে, "আলহামদুলিল্লাহ" এ তো মরেনি, বেঁচে আছে। তাদের দু'জনের গায়ে ডুবুরী-পোষাক। তারা আমাকে বলতে লাগলো, আল্লাহর প্রশংসা, তিনি তোমাকে ডুবে যাওয়া থেকে রক্ষা করেছেন, মৃত্যুর দুয়ারে প্রায় চলে গিয়েছিলে। আল্লাহর অশেষ দয়ায় তুমি বেঁচে গেলে।

তখন কী হয়েছিল- কী হয়নি; কিছুই মনে করতে পারছিনা। শুধু মনে আছে, আল্লাহকে ডাকছিলাম।

দুনিয়া আমাকে একটা ভেল্কি দেখালো। এরপর আমি ভাবনায় পড়ে গেলাম। নিজেকে শোধালাম এই বলে, তুমি তোমার রব থেকে কেন দূরে? কেন তার অবাধ্যতা করছ? উত্তরে আমার মন বলতো, প্রবৃত্তি ও শয়তান আল্লাহ্‌র স্মরণ থেকে তোমার উদাসীনতার জন্য দায়ী। একইভাবে 'দুনিয়াও'।

সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উপস্থিত লোকদের বললাম, এশার ওয়াক্ত হয়েছে? তারা বললেন, হ্যাঁ। সবাইকে অবাক করে দিয়ে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। তারপর অজু করে নামায আদায় করলাম। আর ভাবতে লাগলাম!

আমার সত্যিই বিশ্বাস করতে বিস্ময় লাগছিল। বাস্তবেই আমি নামায পড়ছি?!

আমি জীবনে খুব কমই নামায পড়েছি। একেবারেই কম! তারপরও আল্লাহ আমার প্রতি দয়া করেছেন, আমাকে তার অনুগ্রহে ধন্য করেছেন।

তোমার সাথে আমার ওয়াদা হে আল্লাহ! তোমার অবাধ্য হব না, কখনোই না। শয়তান যদি স্খলন ঘটায়, ইস্তেগফার করবো, কারণ, আমার প্রভু ক্ষমাশীল, দয়ালু। ভয় পাচ্ছিলাম। আল্লাহ যদি আমার তাওবা কবুল না করেন।

রাসুল সা.-এর বানী "নিশ্চয় তাওবা তার পূর্বের সকল পাপ পরিস্কার বাতিল করে দেয়।

অতঃপর অন্তরে প্রশান্তি আসলো, খুব হালকা মনে হলো নিজেকে। বুঝতে বাকী রইলো না যে, আল্লাহ মহান দাতা, বান্দার গোনাহ যখন পাহাড়সম হয়ে যায় বা তারও বেশী তখনও তাওবা করলে তিনি অত্যন্ত খুশী হন, ক্ষমা করে দেন।

ভাবতে ভাবতে দুচোখ অশ্রুসজল হলো, অঝোরে কাঁদতে শুরু করলাম। আমার কান্না সবাইকে কাঁদালো, অঝোর ধারায় অশ্রুবান বইতে লাগলো।

গ. মেয়েদের পিছনে লেগে থাকা এক যুবকের তাওবা

নিশ্চয় এটি একটি মর্মস্পর্শী ঘটনা। আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন এক ব্যক্তি বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন-

আমি একদিন কোন এক কাজে আমার গাড়ি নিয়ে বের হই। কোন এক নিরব-নিস্তব্ধ শাখা রাস্তায় ছোট একটি গাড়িতে আরোহিত এক যুবকের সামনে দিয়ে আমি অতিক্রম করি। অথচ সে আমাকে দেখেনি। কারণ, সে ঐ শূন্য রাস্তাগুলোতে কিছু যুবতীদের পিছু নেওয়ায় ব্যস্ত ছিল।

আমি দ্রুত তার পাশ দিয়ে অতিক্রম করে চলে গেলাম। কিছুদূর গিয়ে মনে মনে বলতে লাগলাম- আমি কি ফিরে গিয়ে ঐ যুবককে কিছু নসিহত করবো, নাকি তাকে তার কাজে ছেড়ে আমি আমার মত চলে যাবো। সে যা মনে চায় তাই করুক?

ভিতরগত সংঘাত কয়েক সেকেণ্ড থাকার পর প্রথম কাজটাই নির্বাচন করলাম। (অর্থাৎ ফিরে গিয়ে তাকে কিছু নসিহত করা)।

আমি দ্বিতীয়বার ফিরে এসে দেখি, সে তার গাড়ি থামিয়ে ঐ মেয়েদের দিকে চেয়ে চেয়ে তাদের একটি দৃষ্টির অপেক্ষা করছে। অতঃপর মেয়েরা গিয়ে একটি ঘরে ঢুকে পড়লো।

আমি আমার গাড়িটি তার গাড়ির কাছে থামালাম। আমার গাড়ি থেকে নামলাম। প্রথমে তাকে সালাম দিলাম। তারপর তাকে নসীহত করলাম। তখন আমি তাকে যা বলেছিলাম-

(ভাই!) একটু ভেবে দেখো তো, এই যুবতীগুলো যদি তোমার বোন বা মেয়ে অথবা অন্যকোন আত্মীয় হতো। আর তাদের সাথে কেউ এই ধরনের আচরণ করত। তবে কি তুমি খুশি হতে? ...

আমি তার সাথে কথা বলার সময় মনে মনে একটু ভয়ও অনুভব করছিলাম। কারণ সে বিশাল দেহী একজন যুবক ছিল। সে চুপচাপ মাথা

নত করে মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনছিল। হঠাৎ সে আমার দিকে তাকাল। তখন আমি দেখতে পেলাম তার গাল বেয়ে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। এতে আমি খুব খুশি হলাম। বুঝতে পারলাম, সে আমার নসীহত গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছে। আমার ভয়ও পূর্ণরূপে দূর হয়ে গেল। আমি তাকে আরও কঠিন ভাষায় কথা বলতে থাকলাম, অবশেষে যখন বুঝতে পারলাম যে, আমার নসীহত চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, তখন থেমে গেলাম।

অতঃপর তাকে বিদায় জানালাম আমি। কিন্তু সে আমাকে থামিয়ে দিল। এবং সে আমার ঠিকানা ও মোবাইল নাম্বার চাইলো। আর সে আমাকে বললো যে, সে প্রবৃত্তির চাহিদা অনুপাতে ধ্বংসাত্মক অবসর জীবন যাপন করছে। তারপর আমি তাকে আমার নাম-ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে দিলাম।

কিছুদিন পর সে আমার বাড়িতে আসলো। তার চেহারা পরিবর্তন হয়ে গেছে। তার আচার-আচরণে ভিন্নতা দেখা যাচ্ছে। লম্বা দাড়ি রেখেছে। তার চেহারা থেকে ঈমানের নূর টপকে পড়ছে।

আমি তার সাথে বসলাম। তারপর সে আমার কাছে ঐ দিনগুলো সম্পর্কে বলতে শুরু করলো। যে দিনগুলো অনর্থক রাস্তা-ঘাটে ঘুরে ঘুরে মুসলিম নর-নারীকে কষ্ট দিয়ে কাটিয়েছে। আমিও তার বিষয়টিকে হালকা করে উপস্থাপন করতে শুরু করলাম। আমি তাকে বললাম, "দেখ! আল্লাহ তায়ালা মহাক্ষমাশীল।" তারপর আমি তাকে কুরআনের আয়াত তিলাওয়াত করে শুনালাম,

"(হে নবী) আপনি আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের জুলুম করেছ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল গুণাহ ক্ষমা করে দিবেন। অবশ্যই তিনি মহাক্ষমাশীল, অতি দয়ালু।" [সুরা যুমার- ৫৩]

তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে গেল। এবং সে বেজায় খুশি হল। অতঃপর সে আমাকে বিদায় জানালো ও আমাকে তার সাথে পুনরায় সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ করলো। কারণ, যে তাকে সিরাতে মুস্তাকীমে চলতে সহযোগিতা

করে, সে তার প্রতি খুবই মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। সুতরাং আমি তাকে পুনঃ সাক্ষাতের ওয়াদা দিলাম।

অনেকদিন কেটে গেল। আর আমিও জীবনের কিছু ব্যস্ততায় জড়িয়ে পড়লাম। ফলে তার সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে গড়িমসি শুরু করলাম।

কয়েকদিন পর একটু সুযোগ পেলাম। তখনই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে চলে গেলাম।

আমি দরজায় নক করলাম। একজন অতি বৃদ্ধ লোক দরজা খুললো। তার চেহারায় চিন্তা ও দুঃখের ছাপ দেখা যাচ্ছিল। খুব সম্ভব, সে তার পিতা হবে।

আমি বৃদ্ধকে আমার বন্ধুর কথা জিজ্ঞেস করলাম। তিনি মাথা নিচু করে ফেললেন এবং কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। তারপর নিচু স্বরে বললেন, "আল্লাহ তার উপর রহম করুক। তাকে ক্ষমা করুক।" তারপর বলতে বলতে এক পর্যায়ে গিয়ে বললেন, "সত্যিই শেষ আমলই নির্ভরযোগ্য।"

অতঃপর তিনি আমার কাছে তার অবস্থা বর্ণনা করতে শুরু করলেন। কিভাবে সে আল্লাহর নাফরমানী করেছে। আল্লাহর আনুগত্য থেকে দূরে রয়েছে। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে আল্লাহ তাকে হেদায়াত দিয়ে অনুগ্রহ করেছেন। সময় ফুরিয়ে যাবার আগেই আল্লাহ তায়ালা তাকে নিজ দয়াতে সংশোধন করে দিয়েছেন।

ঘ. এমন এক তাওবাকারী যার ব্যাপারে আসমানের ফিরিশতারাও বিবাদে লিপ্ত হয়ে গিয়েছিল

এমন একটি ঘটনা, যা বিবেককে নাড়া দিয়ে যায়। একটি উত্তম ঘটনা। সবচে' বিশুদ্ধ ঘটনা। যা কোন লেখকের হাতে লিখিত নয়। গল্পকারদের হাত যাকে স্পর্শও করেনি।

এটা এমন এক ব্যক্তির ঘটনা, যে ছিল পাপিষ্ঠ। বরং সে চূড়ান্ত পর্যায়ের পাপে লিপ্ত ছিল। সে জুলুম করেছে। এবং জুলুমের চূড়ান্ত সীমায় উপনীত হয়েছে। সে নিজের উপর সীমালঙ্গন করেছে। যেন আমি তার তরবারিকে তাজা খুন ঝরাতে দেখছি।

তার পাপরাশি তাকে চতুর্দিক থেকে বেষ্টন করে ফেলেছে। তার অন্তরের কাঠিন্য পাথরকেও হার মানিয়েছে। তার চোখের কোটরীগুলো পাথরে পরিণত হয়ে গেছে।

অতএব, তার অন্তর আর (আল্লাহর ভয়ে) ভীত হয় না। তার চক্ষু অশ্রু ঝরায় না। অথচ রাসুল সা. এমন অন্তর হতে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যেমনটি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।

ঘটনায় বর্ণিত লোকটি ছিল বনী ইসরাঈলের একজন। তার গুণাহ ছিল অনেক বড়। অপরাধ ছিল জঘণ্য। তাহলে সে কী গুণাহ্ করেছিল?! এমন কী অপরাধে সে লিপ্ত ছিল? এমন কী দুঃসাহস সে দেখিয়েছিল?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই সে অন্যায়ভাবে হারাম রক্ত প্রবাহিত করেছে। অসংখ্য নিরপরাধ জান ধ্বংস করেছে।

তোমরা কি মনে করছো, সে একটি মাত্র প্রাণ হত্যা করেছে? না। তবে 'কি' দশটি? তাও না। না, আল্লাহর কসম! সে নিরানব্বইটি জান খতম করেছে। কত নিকৃষ্ট ও কত বড় অন্যায়ই না করেছে। এতকিছুর পরও সে এক সময় অনুশোচিত হলো। তার অন্যায়ের গুরুতরতা বুঝতে পারলো। ফলে সে যাকেই সামনে পায় তাকেই জিজ্ঞাসা করে, আমার মত এত বড় অপরাধীর

তওবার কোন সুযোগ আছে? বারবার সে একই প্রশ্ন করতে থাকলো। অতঃপর তাকে ইলমের নূরবিহীন এক আবেদের সন্ধান দেওয়া হলো।

কিন্তু ঐ ইলমহীন ইবাদতগুযার অপরাধকে ক্ষমার অযোগ্য ভেবে প্রশস্ত জিনিসকে সংকীর্ণ করেছিল। সবকিছুতে আল্লাহর প্রশস্ত রহমতকে সীমাবদ্ধ করে ফেললো। সে বললো, তুমি নিরানব্বইটি প্রাণ হরণ করেছো। সুতরাং তোমার কোন তাওবা নেই। এ কথা বলার সাথে সাথে ঐ ব্যক্তি তরবারি কোষমুক্ত করে ঐ আবেদের মাথা শরীর থেকে পৃথক করে দিল। এবং এভাবেই সে হত্যার সেঞ্চুরী করে।

এরপরেও বারবার চিৎকার করে একই প্রশ্ন করছিল, আমার জন্য কি তাওবার কোন দরজা খোলা আছে?

অতঃপর তাকে এমন এক আলেমের সন্ধান দেওয়া হলো, আল্লাহ তায়ালা যাকে অন্তরদৃষ্টি দান করেছিলেন এবং যিনি ইলমের নূরে আলোকিত ছিলেন।

আলেম উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, অবশ্যই, তোমার জন্য এখনো তাওবার দরজা খোলা আছে। তার প্রশ্ন অনুপাতে এতটুকু উত্তরই যথেষ্ঠ ছিল। কিন্তু আল্লাহওয়ালা উলামায়ে কেরাম রোগ নির্ধারণের সাথে সাথে ঔষুধের কথাও বাতলে দেন। প্রশ্নকারীকে সঠিক ফতওয়া প্রদান করেন। পথহারাকে পথের সন্ধান দান করেন।

তিনি তাকে বললেন, কে আছে তোমার তাওবার পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে? অতঃপর তাকে অনেক দিকনির্দেশনা দিলেন। তারপর বললেন, তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে গিয়ে তুমি অনেক মানুষকে আল্লাহর ইবদত-বন্দেগীতে মশগুল পাবে। সেখানে গিয়ে তুমিও তাদের সাথে আল্লাহর ইবাদতে নিমগ্ন হয়ে পড়। আর কখনোই তোমার দেশে ফিরে আসবে না। কারণ, এটা খারাপ জায়গা।

তারপর লোকটি দীর্ঘ কদমে, দ্রুতবেগে কল্যাণের ভূমির দিকে চলতে শুরু করলো। যখন সে রাস্তার মাঝ বরাবর আসলো, মৃত্যু যন্ত্রণা তার নিকটবর্তী হয়ে গেল। এবং মৃত্যু অনুভব করলো। অবশেষে তার মৃত্যু হয়ে গেলো।

তারপর রহমতের ফিরিশতা ও আযাবের ফিরিশতা বিবাদে লিপ্ত হয়ে পড়লো। রহমতের ফিরিশতা বললো, সে তো আন্তরিকতার সাথে তাওবাকারীরূপে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়েছে। আর আযাবের ফিরিশতা বললো, সে তো জীবনে কোনদিন ভালো কাজ করেনি।

আল্লাহ তায়ালা ররহমতের ফিরিশতাদের কাছে লোকটি নিকটবর্তী হওয়ার ওহী পাঠালেন। আর আযাবের ফিরিশতাগণকে বললেন, তোমরা তার নিকট হতে দূরে সরে যাও। তারপর মানুষের আকৃতিতে তাদের কাছে একজন ফিরিশতা আসলো। তারা ঐ মানুষরূপী ফিরিশতাকে তাদের মাঝে বিচারক হিসাবে নির্বাচন করলেন। বিচারক বললেন, তোমরা দুই দিকে ভূমি মাপো। যেদিকে জায়গা কম হবে, সেদিক বিবেচনায় তার ফায়সালা হবে। তারপর তারা মেপে দেখলো, যেদিকে সে যাওয়ার ইচ্ছা করেছিল, সেদিকে এক বিঘত জায়গা কম পেলো। অবশেষে রহমতের ফিরিশতাই তাকে নিয়ে গেল।

সে আল্লাহর দিকে অগ্রসর হয়েছে। আল্লাহ তায়ালাও তাকে সাদরে গ্রহণ করেছেন। বরং তার জন্য বিশ্বকায়েনাতের চিরাচরিত নিয়ম-কানুন উলট-পালট করে দিয়ে এক জায়গাকে কাছে এনে দিলেন এবং অন্য ভূমিকে দূরে সরিয়ে দিলেন। এবং তার ব্যাপারে সুষ্ঠু ফায়সালা করার জন্য একজন ফিরিশতা পাঠালেন।

এমন কী নেক কাজ করেছে সে যার দ্বারা আল্লাহর এত নৈকট্যপ্রাপ্ত হয়ে গেলো? কী আমল সে করেছে? হ্যাঁ, তেমন কোন আমল করেনি; শুধু খাঁটি তাওবার দ্বারাই সে আল্লাহর এত কাছে পৌঁছে গেছে। তোমরা কি জানো না, আল্লাহ তায়ালা স্বীয় বান্দার তাওবার কারণে কি পরিমাণ খুশি হোন, অথচ তিনি সমস্ত জগৎ হতে অমুখাপেক্ষী, আর তার বান্দাগণই তাঁর প্রতি অতিশয় মুখাপেক্ষী?

নবী সা. বলেছেন, "নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালা (স্বীয় বান্দার তাওবার দ্বারা যখন সে তাওবা করে) তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়ে বেশী খুশি হয়ে থাকেন যে ব্যক্তি কোন মরুভূমিতে নিজস্ব বাহনে আরোহী ছিল। হঠাৎ খাবার-দাবার সহকারে বাহনটি হারিয়ে যায়। অবশেষে বাহনটি খুঁজে না পেয়ে নিরাশ হয়ে এক গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ে। হঠাৎ সে তার বাহনটিকে অক্ষুন্ন অবস্থায় দাঁড়ানো দেখে লাগাম ধরে ফেলে এবং খুশির আতিশয্যে বলে ফেলে, হে আল্লাহ তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার রব! খুশীর আতিশায্যে সে ভুল বলে ফেলেছে।" [সহীহ মুসলিম]

সকল বাদশার বাদশাহ অপরাধের চুড়ান্ত শিখরে উন্নীত এক বান্দাকে এমন কী অনুগ্রহ করলেন, যার কারণে সে আল্লাহর প্রতি ধাবিত হলো। আর আল্লাহও তাকে কাছে টেনে নিলেন।

মূল ঘটনাটি বুখারী, মুসলিমে বর্ণিত আবু সাঈদ খুদরী রা.-এর একটি হাদীস।

ঙ. হতভাগা ও আগুন উসকে দেওয়ার লৌহ শলাকা

এক হতভাগা লোক ছিল। যে হতভাগ্যের চূড়ায় উপনীত হয়েছিল। অনেক গুণাহ করত। তার হতভাগ্যের বিষয় প্রচার-প্রসার করতে একটুও দ্বিধাবোধ করতো না। সে নিরানব্বইজন মানুষ খুন করেছিল। তার প্রত্যেক গুণাহই নতুন অপর গুণাহের 'দিকে নিয়ে' যেত। প্রতিটি অন্যায়ই নতুন আরেকটি অন্যায় করতে উদ্বুদ্ধ করত। সে এক পর্যায়ে আল্লাহর ক্ষমা থেকে নিরাশ হয়ে গেলো। এমনকি তাওবার সুযোগ পাওয়া ও নেক হায়াতের কথা কল্পনা করা থেকেও আশাহীন হয়ে পড়লো।

ঐ হতভাগা একদিন এক আলেম-শাইখের বাড়িতে যাওয়ার ইচ্ছা করলো, এ কথা জিজ্ঞাসা করার জন্য যে, তার কি কোন ক্ষমার সুযোগ আছে? আল্লাহ কি তার তাওবা কবুল করবেন? একদিন শেষ রাতে এসে শাইখের দরজা নক করলো। যখন শাইখ তার কাছে বের হয়ে আসলে, হতভাগা

তার খঞ্জর শাইখের দিকে তাক করলো এবং তার কলার চেপে ধরলো। তারপর তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, আমার রব কি আমাকে ক্ষমা করবেন? শাইখ হতভম্ব হয়ে হতভাগার হাতে পড়ে যেতে লাগলো। তিনি চতুর্দিকে চোখ বুলাতে লাগলেন। হঠাৎ যমীনের উপর একটি লোহার লাঠি দেখতে পেলেন। যেটা দিয়ে তার স্ত্রী চুলার আগুন উসকে দিতো। শাইখ তাকে বললেন, ঐ লাঠি নাও। এবং আজ রাতেই যমীনে পুঁতে দাও। তারপর সকালে সেখানে যাও। যদি গিয়ে দেখ যে, তাতে ডাল-পালা গজিয়েছে ও ফল-ফলাদি ধরেছে, তাহলে বুঝবে, অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমার তাওবা কবুল করবেন এবং তোমাকে ক্ষমা করে দিবেন।

হতভাগা তাকে ছেড়ে দিলো। লাঠিটি উঠিয়ে নিলো। তা নিয়ে এক জনমানবশূন্য প্রান্তরে চলে গলো। এক স্থানে লাঠিটি গেড়ে দিলো। এরপর বাড়িতে ফিরে আসলো।

সে রাস্তার এক কবরস্থানের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছিল। সে রাত্রিতেও কবরস্থান দিয়ে অতিক্রম করতে কোন দ্বিধাবোধ করে না। সে হঠাৎ কবরস্থানের খননের শব্দ শুনতে পেল। সে ধীরে ধীরে খননের জায়গার নিকটবর্তী হলো। এবং একটি কবরের পিছনে চুপচাপ বসে গেল। কী ঘটছে, তা পর্যবেক্ষণ করতে শুরু করলো। একজন লোককে কবর খনন করতে দেখতে পেল। তারপর সে অপেক্ষা করতে থাকলো লোকটি কী করে তা দেখার জন্য। অবশেষে যখন লোকটির কবর হতে মাটি সরানো শেষ হলো এবং লাশ পর্যন্ত পৌছে গেলো, কপাল মুছতে মুছতে বললো, "এবার তো তোমাকে হাতে নাতে পেয়ে গেছি। এখন কোথায় পালাবে? তোমার জীবদ্দশায় তোমার পরিবার আমাকে তোমার থেকে বঞ্চিত করেছে। আর আজ আমাকে তোমার মৃত দেহ থেকে কোনভাবেই বঞ্চিত করতে সক্ষম হবে না।"

হতভাগা তড়িৎ বুঝতে পারলো, লোকটি একটি মৃত যুবতীর দেহকে অপবিত্র করতে চাচ্ছে। সে সাথে সাথে স্বীয় খঞ্জর কোষমুক্ত করে লোকটির উপর আক্রমণ করে বসে। খঞ্জর তার বুকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। এবং তাকে হত্যা করে ফেলল। এরপর কবরের উপর মাটি চাপা দিয়ে সমান

করে দিল। তারপর বাড়িতে চলে গিয়ে প্রভাত হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলো।

যখন দ্বিতীয় দিন ফজর হলো তখন হতভাগা ঐ স্থানে গেলো যেখানে ঐ লাঠি গেড়ে এসেছিল। হঠাৎ সে ডালপালা বিশিষ্ট ও সবুজ পাতা বিশিষ্ট একটি বড় গাছের সামনে উপস্থিত হলো। সে এবার বিষয়টির ব্যাপারে নিশ্চিত হলো। সে মনে করেছে ঐ লাঠিটিই এই বড় গাছ। সাথে সাথে সে গাছটি গোড়া থেকে উপড়ে ফেললো। এবং উহা স্বীয় কাঁধে বহন করে শায়েখের কাছে নিয়ে গেলো। দরজা নক করলো। শায়খ যখন তার সামনে আসলো গাছটি তার সামনে ফেলে দিল। শায়খ হতবাক হয়ে গেলো। তাকে ভিতরে প্রবেশ করতে বললো। এবং তাকে কারগুজারি শুনাতে বললো।

তারপর হতভাগা শায়েখের কাছে ঐ লোকের ঘটনা বর্ণনা করলো। যাকে হত্যা করে সে সেঞ্চুরী করেছে। তখন শায়েখ বললেন, ওহে বৎস! আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তারপর লোকটি তার হাতে চুমু দিলো। ইতিপূর্বের নিকৃষ্ট জীবন হতে ফিরে নতুন জীবনের সূচনা করতে তার সহযোগিতা কামনা করলো। শাইখ তাকে এ ব্যাপারে প্রতিশ্রুতি দিলেন। এবং তার একমাত্র সুশ্রী কন্যার সাথে তাকে বিবাহ দিয়ে দিলেন এবং তাকে তার একজন শাগরিদ বানিয়ে নিলেন।

চ. ৫০ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর পরিপূর্ণ পর্দা আঁকড়ে ধরে

চলুন, ঘটনাটি আমরা সরাসরি বর্ণনাকারীর নিকট হতেই শুনে নিই। তিনি বলেন-

আমার দাদির বোনের পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে। এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও দ্বীনি বিষয়ের কোন তোয়াক্কা করে না। সে শরীয়ত বিরোধী কাপড় পরিধান করতো। আমি ছোট থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত তাকে এমনই দেখেছি। কারণ, সেখানে সৎকাজের আদশে অসৎ কাজের নিষেধ ও

মানুষকে দ্বীনি বিষয় শিক্ষা দানের কাজ আঞ্জাম দেওয়ার মত কোন লোক ছিল না।

আনসারুস সুন্নাতিল মুহাম্মাদিয়্যাহ নামক একটি দাওয়াতি সংগঠনের আবির্ভাব ঘটে। এলাকাতে তারা একটি মারকায ও কুরআনে কারীম হিফজ করানোর জন্য একটি প্রতিষ্ঠান তৈরী করেন এবং মহিলাদের দ্বীনি বিষয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য পৃথক একটি জায়গা নির্ধারণ করেন।

তাদের সবকগুলোতে আমার দাদী অনেক প্রভাবান্বিত হোন। এমনকি নিয়মিত তিনি সবকে উপস্থিত হোন। এবং পাবন্দীর সাথে সময় মত নামায আদায় করেন।

তিনি এখন অপরিচিত লোকদের সাথে মুসাফাহা বর্জন করেছেন। তিনি উম্মি হওয়া সত্ত্বেও কুরআনের ছোট ছোট সুরা মুখস্থ করা শুরু করে দিয়েছেন। চেহারাসহ পূর্ণ শরীর আবৃত এক মহিলাকে একদিন দেখে তিনি বললেন, এটাই তো শরঈ পর্দা। তিনিও পূর্ণ চেহারা ঢেকে শরঈ পর্দার সাথে চলা শুরু করলেন। তাকে একদিন বলা হলো। আপনি তো বৃদ্ধ মহিলা। আপনার তো চেহারা খুলে রাখার সুযোগ আছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন-

“বৃদ্ধা নারী যারা বিবাহের আশা রাখে না তারা যদি সৌন্দর্য প্রকাশ করা ব্যতীত কাপড় খুলে রাখে, এতে কোন দোষ নেই।” তিনি বললেন, তোমরা আয়াতটি পুরা পড়- “তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।” [সুরা নুর- ৬০]

আমি পবিত্র থাকতে চাই। আমি ছোট থাকতে দ্বীনি বিষয়ে অজ্ঞ থাকায় অনেক বেপর্দাভাবে চলেছি। আমার রবের অবাধ্যতা করেছি। এখন আমি বৃদ্ধ বয়সে দ্বীনি বিষয়ে অবগত হয়েছি। সুতরাং এখন আমি তার অনুগত্য করবো। আমার চেহারা ঢেকে রাখবো।

ওহে মহিলা জাতি! তোমাদের জন্য ইলমে না'ফে বা উপকারী ইলম অর্জন করা ফরজ। কারণ, ইলম ছাড়া ইবাদত মানুষকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়।

আমি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করছি যে, তিনি যেন আমার তাওবা কবুল করেন। আমার প্রতি রহম করেন। আমার অতীত জীবনের গুণাহ ক্ষমা করে দেন। নবী করীম সা. বলেন-

"আল্লাহ গড়গড়ার পূর্ব পর্যন্ত বান্দার তাওবা কবুল করেন।"

"গুণাহ থেকে তাওবাকারী নিষ্পাপ ব্যক্তির মত হয়ে যায়।"

এভাবেই দ্বীনি বিষয় আঁকড়ে ধরলেন আমার দাদী। আর এখন তো তিনি ৩০ নাম্বার পারা মুখস্থ করছেন। অথচ তিনি কোরআনের কোন অংশই মুখস্ত করতে পারতেন না। তার দেখাদেখি তার সাথে বাড়িতে তার ছোট ছোট নাতী নাতনীরাও শরীয়ত মেনে চলা বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে। সাথে সাথে শরঈ পর্দাও বাধ্যতামূলক করে নিয়েছে।

আল্লাহর অপার অনুগ্রহে অতঃপর এই জামাআতের সহযোগিতায় পুরুষ-মহিলা সকলেই সুফীবাদ ও তার অন্ধ গোড়ামী থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে শরঈ ইলম এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জরুরী বিষয়াবলী শিক্ষা করা শুরু করে দিয়েছে।

ছ. দুই চোর ও তীন গাছ

বর্ণিত আছে, দুই চোর একত্রে চুরির ব্যাপারে একমত হলো। চুরি করে যা পাবে উভয়ে সমান ভাগে ভাগ করে নিবে। দুইজনের একজন ছিল একটু ভীতু। অপরজন সাহসী।

ভীতুঃ ভাই! মানুষ যদি আমাদের দেখে ফেলে, আমাদেরকে ধরে বিচারকের হাতে উঠিয়ে দেয়। তখন আমরা কী করবো?

সাহসীঃ আমাদের জন্য অত্যাবশ্যক যে, মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় এমন জায়গা হতে আমরা কিছু চুরি করবো না। তাহলেই তো মানুষ আমাদের দেখবেও না এবং আমাদের সম্পর্কে জানতেও পারবে না।

এবার তারা চুরি করতে বের হলো। যখনই একটা কিছু চুরির মনস্থ করেছে, হঠাৎ দেখে একজন মানুষ তাদের দেখছে। ফলে তারা ঐ জিনিস না নিয়ে অন্য কোথাও চলে গেলো। এক পর্যায়ে তাদের প্রচণ্ড ক্ষুধা পেল। তাই তারা শহরের বাহিরে বাগ-বাগিচার দিকে বের হলো।

সাহসীঃ ভাই! দাঁড়াও। এ তীন গাছ থেকে কিছু নিয়ে আপাতত আমাদের ক্ষুধাটা নিবারণ করি।

ভীতুঃ ঠিক আছে। তাহলে তুমিই গাছে উঠো। আর আমি এখানে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করছি, কেউ আমাদের দেখে কিনা?

সাহসী গাছে উঠে ভীতুকে নিশ্চিত হওয়ার জন্য জিজ্ঞাসা করলো, দেখো তো আমাদের কেউ দেখছে কিনা?

ভীতুঃ সামান্য একটু চিন্তা করে বললো, ভাই! তাড়াতাড়ি নেমে আসো। কিছু নেওয়ার দরকার নেই। আমাদেরকে তো একজন দেখছেন।

সাহসীঃ দ্রুত গাছ থেকে নেমে আসলো। উভয়ে দাঁড়িয়ে পালাতে লাগলো।

ভীতুঃ দৌড়িয়ো না। তাড়াহুড়া করো না ভাই! কারণ, যিনি আমাদের দেখছেন তাঁর থেকে কোন কিছুই বাঁচতে পারে না। তিনি তো সবসময়ই আমাদেরকে দেখেন। আমাদের সম্পর্কে জানেন।

সাহসী অবাক হয়ে জানতে চাইলো, ভাই! সে আবার কে?

ভীতুঃ তিনিই তো ঐ আল্লাহ, যিনি আমাদের মাথার উপর আছেন। তিনি তো সবকিছুই জানেন। সকল কিছুই তার ইলমের আওতাধীন। তিনিই আমাদেরকে ও সমস্ত মাখলুককে পর্যবেক্ষণ করেন।

সাত আসমান, সাত যমীনের কোন কিছুই তাঁর ইলমের বাহিরে নেই। কারণ সকল কিছু তার ইলমের মাধ্যমেই আবির্ভূত হয়।

সাহসীঃ ভাই! ব্যাপারটা যদি এমনই হয়, তাহলে তো আমাদের আর চুরি করার সুযোগ নাই।

ভীতুঃ হ্যাঁ, অবশ্যই আমাদের এ দুষ্কৃতি ছেড়ে দিতে হবে। এবং মহান রিযিকদাতা একক আল্লাহর উপরই আমাদের ভরসা করতে হবে। তিনিই আমাদের ব্যাপারে ভালো জানেন। আর তিনিই আমাদের রিযিকের যিম্মাদার।

তৎক্ষণাৎ উভয়েই মনে মনে সংকল্প করলো রবের অসন্তুষ্টির কারণ হয় এমন কোন কাজ কখনোই করবে না। বরং আল্লাহ তাআলাকে নিজেদের চোখের সামনে মনে করতে লাগলো। কারণ তিনিই তো সর্বাবস্থায় তাদেরকে ও সমস্ত মানুষকে পর্যবেক্ষণ করে থাকেন।

বলা হয়- পরবর্তীতে তাদেরকে শহরের বড় বড় ব্যবসায়ীদের মধ্যে গণ্য করা হয় রিযিক অন্বেষণের বরকতে।

দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত

[তৃতীয় খণ্ড আসবে ইনশাআল্লাহ]

আপনার সংগ্রহে রাখার মত আমাদের আরো কিছু বই:-

১. সালাতে খুশু খুজুর উপায়
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ]
২. কুফর থেকে সাবধান
[শায়খ আবু হামজা আল-মিশরী]
৩. সিফাতুর রাসূল সা.
[আহমাদ মুস্তোফা কাসেম আত-তাহতাভী]
৪. আন্তরিক তাওবা
[আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম জাওজি রহ.]
৫. আমি তাওবা করতে চাই কিন্তু...
[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ]
৬. তাওহিদ ও শিরক: প্রকার ও প্রকৃতি
[শাইখ জুনাইদ বাবুনগরী হাফিজাহুল্লাহ]
৭. মঞ্চ কাঁপানো বক্তৃতা
[মুহাম্মাদ আবু ওমর]
৮. মিরাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান
[ড: মো: আবুল কালাম আজাদ]
৯. খুতুবাতে মাদরাজ
[সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী রহ.]
১০. কারা জান্নাতী কুমারীদের ভালোবাসে (১ম খণ্ড)
[ড: আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.]
১১. ইতিহাসের পূনরাবৃত্তি হবে কি?
[শাইখ মুহাম্মাদ আল আবদাহ্]
১২. ইমাম তাইমিয়ার সংগ্রামী জীবন

[মুফতি যুবায়ের খান]

১৩. এসো ঈমান মেরামত করি

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ]

১৪. যেসকল হারামকে অনেকেই তুচ্ছ মনে করে

[শাইখ মুহাম্মাদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ]

প্রকাশের পথে-

১. তাফসীরে সুরা তাওবা (২য় খন্ড)

[শহীদ ড. আব্দুল্লাহ আযযাম রহ.]

২. মুনাফিকী থেকে বাঁচার উপায়

[শায়খ মুহাম্মাদ সালেহ আল মুনাজ্জিদ]

৩. আকসার অশ্রু

[শায়খ আবু লুবাবা শাহ মানসুর হাফি.]